GIFT

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক পর্যালোচনা"

Dhaka University Library
449622
449622

তত্ত্বাবধায়ক
ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সুকান্তা করিম
এম .ফিল গবেষক
রেজিষ্ট্রেসন নং-১৩৪
সেশন-২০০২-২০০৩
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হলো)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আগষ্ট-২০১০

449622

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬৪৯০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
E-mail : duregstr@bangla.net

তারিখ :

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে,সুকান্তা করিম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশবিদ্যালয় কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক পর্যালোচনা"শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে।আমার জানামতে,এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

449622

ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন
২২.৮.১০.
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে,আমি সুকান্তা করিম, এম ফিল গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এম ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক পর্যালোচনা"শীর্ষক আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন, অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষনা করেনি।এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রীর জন্য কখনো প্রকাশিত হয়নি।

বিনীত
সুকান্তা করিম
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449622

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

মা ও বাবার পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়, তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্বাবধান ও নৈতিক সমর্থনের জন্য। তাঁর অপরিসীম ভালবাসা,স্নেহ মমতা ও অভিভাকত্ব আমার হৃদয় পূর্ণ করেছে যা আমার মা-বাবার অভাবকে বুঝতে দেয়নি।তিনি পরম মমতায় অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার সকল সমস্যার কথা শুনেছেন এবং সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার,স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাদের বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িকী ব্যবহারের অনুমতিপ্রদানের জন্য। এছাড়াও ইউএনডিপি (UNDP), ইউনিসেফ (UNICEF), কেয়ার এর নিকট থেকে বিশেষ সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বোপরি আমার সকল শুভানুধ্যায়ী যারা গবেষণার কাজে সহযোগীতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিনীত

সুকান্তা করিম

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬৪৯০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
E-mail : duregstr@bangla.net

তারিখ :

সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অনুমতিপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সুকান্তা করিম,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এম,ফিল গবেষনায়রত।তার গবেষণার বিষয় "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক পর্যালোচনা"। তার গবেষনার অংশ হিসাবে রাজনৈতিক নেত্রী,নারী সাংসদ ও সাধারন নারী পুরুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রয়োজন। এলক্ষ্যে আপনার/আপনাদের সার্বিক সহযোগীতা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে,আপনাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সকল তথ্য কেবলমাত্র গবেষনার কাজেই ব্যবহার করা হবে। এক্ষেত্রে সার্বিক গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

তত্ত্বাবধায়ক

ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে যে কোনো নীতিমালা তৈরির সময় নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব ও সমঅধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলই হচ্ছে ক্ষমতায়নের প্রধান উৎস ও বিচরণক্ষেত্র। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সরব পদচারণা ইদানীং ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা হয়ে উঠলেও এখনো বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রন খুবই নগণ্য। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে নারীর বিযুক্তির কারণ নিহিত রয়েছে বৈষম্যমূলক আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে। বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন নীতিমালায় নারীর সমঅধিকার ও সমঅংশীদারিত্বের কথা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত থাকলেও প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীকে এখনো দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসেবে দেখা হয় বলেই রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তথা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। ভোটার হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশনিলেও প্রার্থী হিসেবে নারীদের অংশ নিতান্তই নগন্য। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অবস্থাটা কারোর কাম্য নয়।

সাম্প্রতিককালে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান লক্ষণীয়ভাবে বাড়লেও রাজনৈতিক কিংবা জনজীবনে তার প্রতিফলন ঘটেনি এখনও। অথচ আমরা জানি, যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতিই হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল হাতিয়ার। রাজনীতির মাধ্যমেই যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। রাজনৈতিক দল, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, সেখানে নারীর অংশগ্রহণ না থাকার ফলে নারী যেমন তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হচ্ছে তেমনি জেন্ডার-সংবেদনশীলতার অভাব বা পুরুষের আধিপত্য থেকেই যাচ্ছে সকল ক্ষেত্রে। নির্বাচনমূলক রাজনীতিতে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস খুবই নিকট অতীতের। ফলে রাজনীতির প্রক্রিয়ার সকল দিক সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা একেবারেই সীমিত।বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই নারীরা মাত্র বিগত ৩০ বছরের মধ্যে ভোটাধিকার অর্জন করতে পেরেছে। সুইজারল্যান্ডের মতো উন্নত দেশেও নারীরা ১৯৭১ সালে ভোটাধিকার লাভ করেছে। সারা বিশ্বের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি। কিন্তু চলমান লিঙ্গীয় বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব কিনা তাই এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

যদিও Parlo Freire তার Pedagogy of the oppressed গ্রন্থে ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতার বিষয়টি আলোচনা করেন, ঐতিহাসিকভাবে Mary Wollstonecraft কেই ১৭৭২ সালে প্রকাশিত A vindication of the rights of women গ্রন্থ এবং দীর্ঘজীবনের কর্মকান্ডের জন্য নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। । সভ্যতার ইতিহাস বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পিতৃতন্ত্রই পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের এক অধ্যায়ের সূচনা করে। এ ইতিহাস নারীর জন্য এক অধস্তন মর্যাদা দান করে এবং পশ্চাদপদ অবস্থায় তাকে পর্যবসিত করে। ঐতিহ্যগত সমাজ থেকে আধুনিক সমাজ রুপান্তরের সময়েও এ অবস্থা টিকে রয়েছে। গত আড়াই দশকে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আলোচনায় অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোকে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে, উদাহরণস্বরুপ ধরীত্রি সম্মেলন (১৯৯২), মানবাধিকার সম্মেলন (১৯৯৩), জনসংখ্যা সম্মেলন (১৯৯৪), বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫, ৯৯, ২০০২) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এর গুরুত্ব যে কেবল নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য তা নয় বরং নারীর সার্বিক উন্নয়নে এর অবদান অনস্বীকার্য। যখন উন্নয়নশীল দেশের নারীরা গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থায় তাদের আত্ম পরিচিতি তুলে ধরার মাধ্যমে শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়, তখন উন্নয়নে নারী নামক এক নূতন চিন্তা ধারার সূত্রপাত ঘটে।

৭০ এর দশকে আধুনিকায়ন তত্ত্বের সমালোচনার ধারায় উন্নয়নে নারী (Women In Development -WID) নীতিমালার উদ্ভব। এই আধুনিকায়ন তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সুফল আপনাআপনি চুঁইয়ে পড়ে নারীদের কাছে পৌছবে। ঐ সময় প্রখ্যাত নারীবাদী অর্থনীতিবিদ ইস্টার বোসেরাপ'র (Ester Boserup) সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি প্রথমবারের মতো জেন্ডার সচেতন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষি অর্থনীতিতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাগের (sexual division of labour) বিষয়টি তুলে ধরেন এবং সমাজের আধুনিকায়নের সঙ্গে প্রচলিত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করেন। তিনি পুরুষ ও নারীর কাজের উপর এ

Dhaka University Institutional Repository

সকল পরিবর্তনের চিহ্নিত ফলাফলগুলি পরীক্ষা করে তথ্যসহ প্রমাণ করেন যে ৬০-৭০ দশকের উন্নয়নের সুফল পুরুষের তুলনায় নারীর কাছে পৌছেচে অনেক কম। কেননা দেখা গেছে আধুনিকায়নের সুফল সমভাবে বন্টিত হয়ে আদৌ নারীর কাছে পৌছেনি। পুরুষ এবং নারী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উন্নয়নের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এমনকি নারীদের অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে আরো নিম্নগামী হচ্ছে। নারীরা কেবল তাদের পুনঃউৎপাদন বা প্রজননমূলক ভূমিকায় আবদ্ধ এই প্রচলিত ধারণার বদলে নারীদের উৎপাদনশীলতার উপর তিনি দৃষ্টিপাত করেন এবং কৃষিতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উপর জোর দেন।

নারীকে ব্যক্তিসত্তা হিসেবে গণ্য করা ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও নারীবাদের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সকল নাগরিক একই আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার পায় এবং সমতা বিরাজ করে। রাষ্ট্রে লিঙ্গ, মর্যাদা, সম্পদ ও জাতিভেদে সকল নাগরিক সমান। কাজেই সামাজিক এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যা 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোকে সুনির্দিষ্ট মাত্রার ঐক্যমত্যের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্পন্ন হতে পারে। এভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দৈনন্দিন গণতান্ত্রিক অধিকারের মাত্রা সূচিত হয়। এখানে নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার জড়িত এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্দেশ করে। এটি এমন কতক কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে নাগরিকরা সরকারী নীতিমালাকে প্রভাবিত করতে পারে। কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রত্যয়টিকে সরাসরি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করেছে। অন্যরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে আরো সুনির্দিষ্ট করেছেন। ভোট দেওয়া, রাজনৈতিক দলের জন্য প্রচার করা রাজনীতি সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখা, গণসমাবেশে ও আলোচনায় যোগ দেওয়া ইত্যাদি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হতে পারে আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে এবং নারীর ক্ষেত্রে দৈনন্দিন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ।গণতন্ত্রের মাত্রা ও সকল নাগরিকের অধিকার অর্জন নির্ভর করে তাদের অংশগ্রহণের লেভেলের উপর। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য পদ/অবস্থানের বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

বাংলাদেশের নারীদের সবচাইতে স্বাভাবিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হচ্ছে নির্বাচনে ভোট প্রদান। ঔপনিবেশিক আমল থেকে সহজসাধ্য ও কম বিধি-নিষেধসম্পন্ন এই ভোটদান প্রক্রিয়ায় নারীরা অংশ

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে আসছেন। পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিতে সীমিত সুযোগ থাকার কারণে নারী রাজনীতিক কর্মীরা মহিলা সংগঠনগুলোতে অংশ নেয়াকেই অধিক কার্যকর মনে করেন। তাই তাদের রাজনীতিক আভলাষ ও প্রচেষ্টাকে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত না করে নারী সংগঠন বিনির্মাণে কাজে লাগান। যেহেতু তুলনামূলকভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কম সেহেতু রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ধারায় তারা আজও প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছেন। এজন্য সংসদের সংরক্ষিত আসনে ও রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখায় তাদের অন্তর্ভুক্তি দেশের সংবিধান এবং নির্বাহী আদেশ দ্বারা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমানাধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও নারীদের পশ্চাৎপদতার কথা ভেবে আইনসভায় মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের সুযোগে সৃষ্ট করা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় নারীরা স্বতন্ত্র বা রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে সরাসরি নির্বাচনে অংশ নেয়ার অধিকার হারান নি। তাই বাংলদেশে নারীরা জাতয়ি সংসদে দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করেছেন।

প্রকৃত অর্থে নারীর স্বাধীনতা বা উন্নয়ন সেই দেশের সুষ্ঠু শাসন প্রক্রিয়ার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নীতির মাধ্যমে নারীকে যে অধিকার বা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নারীর উন্নয়ন নিশ্চিত করে। ফলে 'গুড গভর্ন্যান্স' বা সুশাসনের বিভিন্ন উপকরণসমূহ বাংলাদেশে কতটুকু কার্যকর তার উপরই নির্ভর করে বাংলাদেশের শাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান। সুশাসন কায়েম না হলে রাষ্ট্রের মতাদর্শ ও নীতিমালার সাথে বাস্তবতার বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল পদক্ষেপ বা উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৭২ সনে প্রণীত সংবিধান জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংবিধান প্রবর্তনের সময় থেকে ১০ বৎসরের জন্য সংরক্ষিত রাখে। ১৯৭৮ সনে সংশোধনীর মাধ্যমে এ সংখ্যা যথাক্রমে ৩০ ও ১৫-তে বর্ধিত করা হয়। ১৯৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংসদ ভেঙ্গে দিলে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত আসন প্রথাও অবলুপ্ত হয়। এ সময় ও পরবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে কিছু নারী সংগঠন সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা পূর্ণবহাল করার দাবী জানায়, বিশেষভাবে দুটি মাত্রা সংযোজন করেঃ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন। ১৯৮৮ সনে জাতীয় সংসদ দশম সংশোধনীর মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে ১০ বৎসরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেন। (সাংবিধানিক আইন,১৯৯০)নির্বাচন পদ্ধতি অপরিবর্তিত রয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য, এরশাদ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত আসনের মনোনয়ন-নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর আরোপিত চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে ১৯৯১ সনে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্বাবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়।

কোটা ও সংরক্ষিত আসন সংসদে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। তবুও এগুলোর কোনটিই বাংলাদেশী নারীর জন্য সুবিধাজনক হয়নি। অন্ততঃপক্ষে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা সংসদে নারীর অগ্রগতির জন্য অন্যতম রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড হয়ে উঠেনি। যাইহোক, সমস্যাটি ছিল নীতিতে যা সংসদে প্রয়োগ করেছে, রাজনৈতিক দলগুলোতে নয়। এবাবে নীতিটি দুর্বল ও অকার্যকর প্রমানিত হয়েছে। সংরক্ষিত আসনের কোন নির্দিষ্ট টার্গেট না থাকলে, নারীর সংসদীয় উপস্থিতি ৭ বা সাধারণ নির্বাচনে মাত্র ২ শতাংশ হতো। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ডোনার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের সামরিক সরকার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা চালু করেছে। যেহেতু তারা এর কোন ব্যাখ্যা দেয় না, তাই নারী গোষ্ঠী এতে কোন আগ্রহ দেখায় না।

প্রথম অধ্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।এই ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত অন্যান্য উপাদান গলো যেমন নারীর সম-অধিকার,সিদ্ধান্ত গনারীর ক্ষমতায়ন অনেকাংশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার না দিলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। বাংলাদেশের নারী অধঃস্তনতা সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সকল স্তরে অত্যন্ত ব্যাপক। পিতৃতান্ত্রিকতা, পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং বিদ্যমান মূল্যবোধ এসবই জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে যে কোনো নীতিমালা তৈরির সময় নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব ও সমঅধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান লক্ষণীয়ভাবে বাড়লেও রাজনৈতিক কিংবা জনজীবনে তার প্রতিফলন ঘটেনি এখনও। অথচ আমরা জানি, যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতিই হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল হাতিয়ার। রাজনীতির মাধ্যমেই যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত ওবাস্তবায়িত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই নারী বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।এক্ষেত্রে মতাদর্শিক ও বস্তবাদী ব্যাখ্যার অবতারনা করা হয়েছে।এর পরেই ক্ষমতায়ন বিষয়ে সামান্য ধারনা দেওয়ার পরপরই রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

গেছে।এক্ষেত্রেম মার্টি চেইন এর ক্ষমতার দৃষ্টিকোন থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।মার্টি চেইন ছাড়াও মোজার,পাবেলো ফ্রেইরি এর বক্তব্য এবং ধরীত্রি সম্মেলন(১৯৯২),মানবাধিকার সম্মেলন(১৯৯৩), জনসংখ্যা সম্মেলন(১৯৯৪), বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫, ৯৯, ২০০২) এর উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরেই উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।এখানে উইড আলোচনা করতে গিয়ে উন্নয়নে নীতিমালার কৌশল, ধরন এবং সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।উইড এপ্রোচের ব্যর্থতার মাধ্যমে যে জেন্ডার ও উন্নয়ন তত্তের আলোচনা করা হয়েছেতা বিশদভাবে আলোচনা করা হযেছে। এটি নারী জীবনের সকর দিক কে ধারন করে নারী কর্তৃক সম্পাদিত উৎপাদনমূলক ও পুন:উৎপাদনমূলক,ব্যক্তিগত বা সামাজিক সকর ধরনের কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়।

নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের অভিমত তুলে ধরা হয়েছে। ক্যারোলিন মোজার,জো রাউল্যান্ডস,প্রাইসেস,জন ফ্রাইডম্যান ও কোট ইয়ং। মোজার ক্ষমতায়নকে বিবেচনা করেছেন নারীর আত্মবিশ্বাস ও আভ্যন্তরীন শক্তি বৃদ্ধির ক্শতা হিসাবে।,জো রাউল্যান্ডস ক্ষমতার চারটি রুপের কথা বলেছেন ।নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের আলোচনা করার পর নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করা হয়েছে যথা-উদারনৈতিক নারীবাদ,মার্কসীয় নারীবাদ,সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ,র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ,সাংস্কৃতিক নারীবাদ,পরিবেশ নারীবাদ ও বৈশ্বিক নারীবাদ।এর পরে আইনসভার প্রেক্ষাপটে নারী বিষয়ক একটি তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়াস পাওয়া গেছে।এক্ষে গণতন্ত্রকে কেন্দ্র করে হেজিমোনী,সিভিল সমাজ ও বিভিন্ন নারী আন্দোলনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের এক সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে।বৃটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙ্গালী নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর উল্লেখযোগ্য অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ।এর পরেই উপমহাদেশের নারীদের সাথে বিশ্ব রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের এক তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের শুরু থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত এক সংক্ষিপ্ত বর্ননা প্রদান করা হয়েছে,বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারের আমলে এক

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।এছাড়াও পিতৃতন্ত্র নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে কিছু বাধার সৃষ্টি করে তারও এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারী সম্মেলন ও এর প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের নারী আন্দোলনে সহযোগিতা প্রদান করেছে।১৯৪৬ সালে রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।জাতিসংঘ সম্মেলন ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়--মেক্সিকো সম্মেলন(১৯৭৫) সিডো,কোপেনহেগেন সম্মেলন,নাইরোবী সম্মেলন ইত্যাদি এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।উপরোক্ত সম্মেলনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার কিকি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে তারও এক সংক্ষিপ্ত বিবরন এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার মূল বিষয় যথা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সাধারন আসন ও সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ক পর্যালোচনা করা হয়েছে।জাতীয় সংসদে নারীর প্রথম অংশগ্রহনের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে তুলে ধরা হয়েছে।১৯৭২ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত জাতীয় সংসদে নারী আসন বিষয়ক যেসব সংশোধনী আনা হয়েছে তারও বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।বাংলাদেশের আলোচনার পাশাপাশি আন্ত জার্তিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে এক তুলনামুলক আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নারী বিষয়ে সুফল আলোচনার সাথে সাথে এর সমস্যাও আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে জাতীয় সংসদে সাধারন আসন ও সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ক একটি প্রশ্নমালা প্রণয়নের মাধমে ৬০ জন নারী ও ৪০ জন পুরুষের সাক্ষাতকার গ্রহনের মাধ্যমে উপাত্ত বিশ্লেষনের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সারনী ও চিত্রের মাধ্যমে।

সপ্তম অধ্যায়ে সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সাধারন আসন ও সংরক্ষিত আসন বিষয়ে যে সব সমস্যা উঠে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সপারিশ করা হয়েছে।

এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে,দলে সঠিক মূল্যায়ন না হওয়ায় রাজনীতি থেকে নারী কর্মীরা ঝরে পড়ছেন। শিক্ষাজীবনে বহু মেয়ে সক্রিয় রাজনীতি করলেও পরবর্তী সময়ে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়না। নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে জোড়ালো অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও তার যথাযথ বাস্তবায়ন হয়না। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের বিষয়েও ঐক্যমত্যে পৌছুতে পারছে না দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বি এন পি।

Dhaka University Institutional Repository

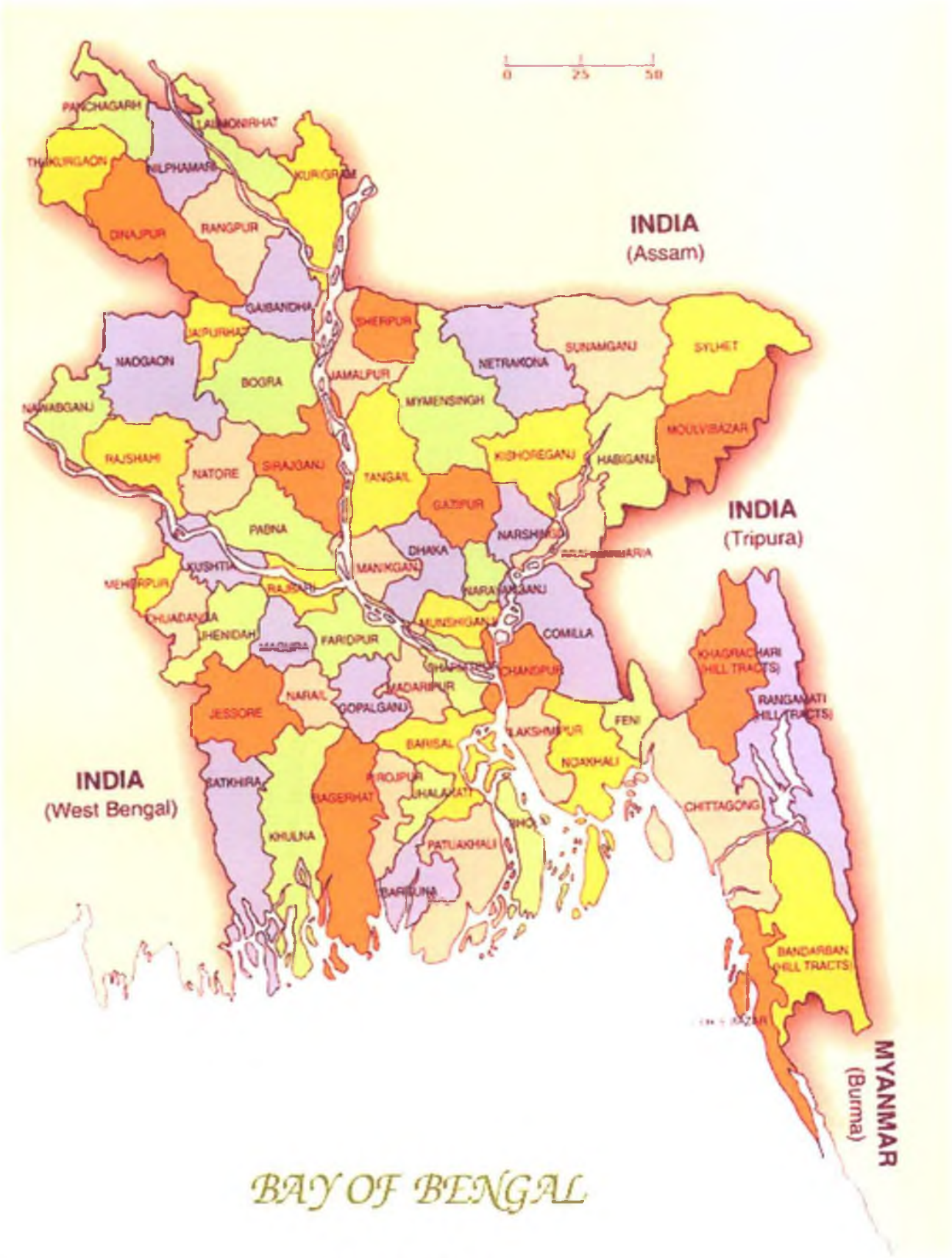

বাংলাদেশের মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

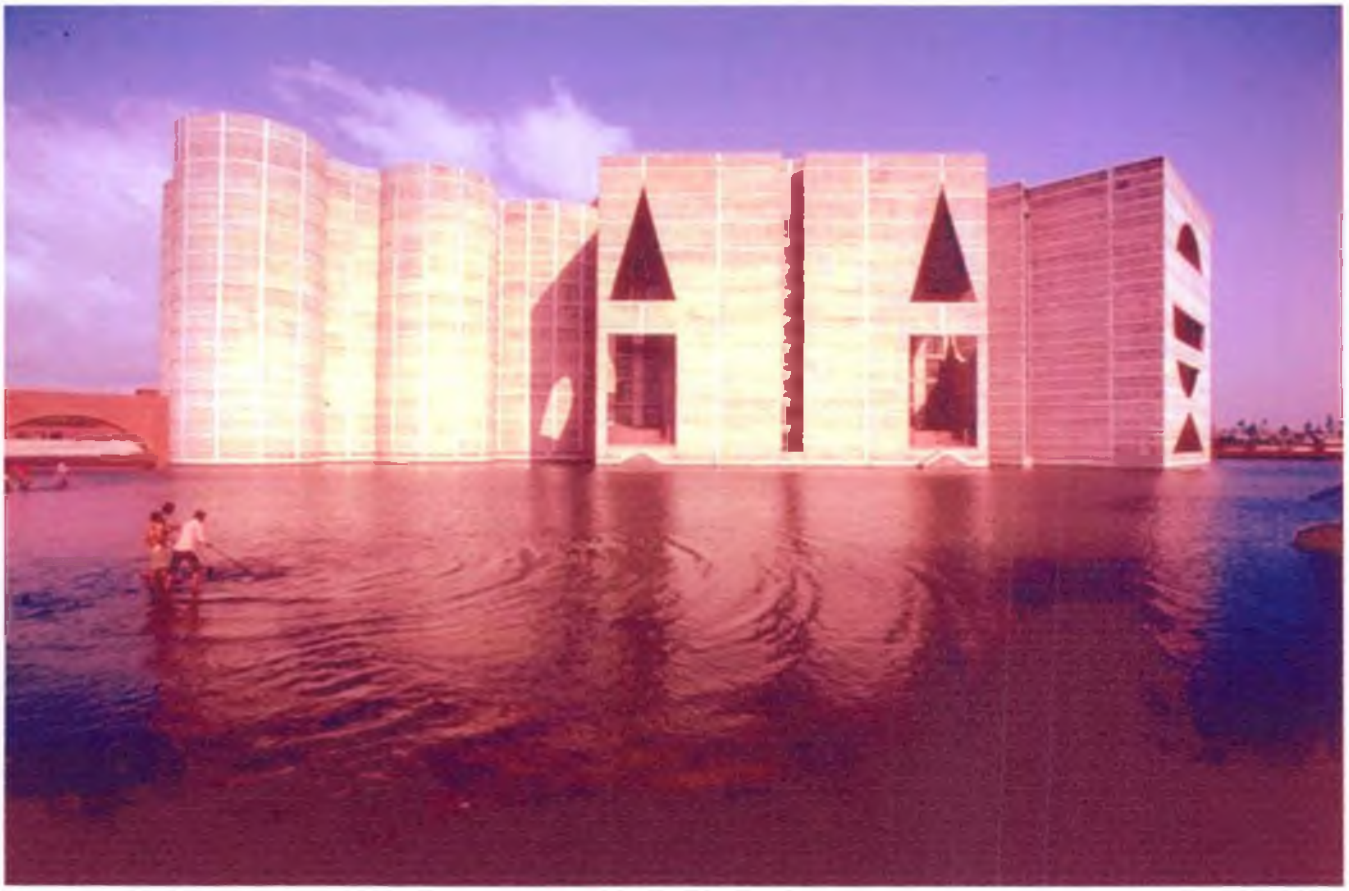

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

প্রত্যয়নপত্র

ঘোষণাপত্র

উৎসর্গ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অনুমতিপত্র

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানচিত্র

ঢাকার মানচিত্র

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন

প্রথম অধ্যায়:নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন ১-৮

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণার বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষণার ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

দ্বিতীয় অধ্যায়:তাত্ত্বিক ধারণা; নারী, রাজনীতি, ক্ষমতায়ন, ও সংবিধান ৯-৩৪

২.১ নারী

২.২ ক্ষমতায়ন

২.৩ নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের অভিমত-(১)ক্যারোলিন মোজার (২) জো রাউল্যান্ডস (৩)প্রাইসেস (৪)জন ফ্রাইডম্যান (৫)ক্যাট ইয়ং

২.৪ নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

(১) উদারনৈতিক নারীবাদ

(২) মার্কসীয় নারীবাদ

(৩) আমূল বা র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ

Dhaka University Institutional Repository

(৪) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ

(৫) সাংস্কৃতিক নারীবাদ

(৬) পরিবেশ নারীবাদ

(৭) বৈশ্বিক নারীবাদ

২.৫ আইনসভায় নারীর তাত্ত্বিক ধারণা
(১) গণতন্ত্র ও নারীবাদ

(২) গণতন্ত্র এবং পিতৃতন্ত্র

(৪) গণতন্ত্র এবং হেজিনোনি

(৫) গণতন্ত্র, সিভিল সমাজ এবং নারী আন্দোলন

২.৬ নারীর সাংবিধানিক অধিকার

২.৭ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

২.৮ উন্নয়নে নারী

২.৯ 'উন্নয়নে নারী' নীতিমালার কর্মকৌশল

২.১০ উন্নয়নে নারী নীতিমালার বিভিন্ন ধরণ

২.১১ উন্নয়নে নারী' নীতিমালার সীমাবদ্ধতা

২.১২ জেন্ডার এবং উন্নয়ন

২.১৩ জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালার বৈশিষ্ট্য

২.১৪ নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার উন্নয়নের মূল পার্থক্য

২.১৫ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ ও নারী উন্নয়ন

তৃতীয় অধ্যায়:নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। ৩৫-৬১

৩.১ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নারী:

৩.২ বৃটিশ আমলে রাজনীতিতে বাঙ্গালী নারীর অংশগ্রহণ

৩.৩ উপমহাদেশ ও বিশ্ব রাজনীতিতে নারী

৩.৪ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী

৩.৫ রাজনীতি ও নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারী

৩.৬ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

৩.৭ পিতৃতন্ত্র ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ নারী দাবি এবং রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ: প্রারম্ভিক পর্যায়

৩.৯ নারী নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রে পদক্ষেপ

৩.১০ আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র

৩.১১ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী

৩.১২ নারী প্রতিনিধিত্ব

৩.১৩ পঞ্চম জাতীয় সংসদে নারী

৩.১৪ সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী

৩.১৫ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী

চতুর্থ অধ্যায়:বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ৬২-৯২

৪.১ জাতিসংঘ ও বিশ্ব নারী সম্মেলন

৪.২ মেক্সিকো সম্মেলন (১৯৭৫)

৪.৩ সিডও

৪.৪ সিডও বাংলাদেশের আইন বিধান

৪.৫ কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০)

৪.৬ নাইরোবী সম্মেলন (১৯৮৫)

৪.৭ অন্যান্য জাতিসংঘ সম্মেলন

৪.৮ রিওডিজেনেরো (১৯৯২)

৪.৯ জাকার্তা ঘোষণা (১৯৯৪)

৪.১০ বেইজিং সম্মেলন ১৯৯৫

(ক) এক নজরে প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন

(খ) PFA-র সুবিধার দিকগুলি

(গ) বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন বা পিএফএ (PFA)'র সামগ্রিক কাঠামো

(ঘ) বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন কেন গুরুত্বপূর্ণ :

৪.১১ বেইজিং+৫ (২০০০),

৪.১২ বেইজিং+১০(২০০৫)।

৪.১৩ নারীর অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উদ্যোগসমূহ,

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৪ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান,

৪.১৫ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

(১) প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন

(২) প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসাধন পদ্ধতি (Institutional Mechanism)

৩) সেক্টরভিত্তিক বা খাতওয়ারি চাহিদা নিরূপণ

(৪) জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার খসড়া

(৫) জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা সাংবিধানিক বিধানসমূহ

(৬) সরকারী পরিকল্পনা ও অঙ্গীকার

(৭) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার দর্শন

(৮) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার লক্ষ্য

(৯) বাংলাদেশ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

(১০) জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কৌশল

(১১) নীতিমালা প্রণয়ন / সংশোধন এবং নারী ইস্যু সংযুক্তি

(১২) ম্যান্ডেটের সংশোধন

(১৩) নীতি নির্ধারণী কাঠামোয় নারীর প্রতিনিধিত্ব

(১৪) সকল পর্যায়ে মহিলা কর্মকর্তাদের সংখ্যা/ অনুপাত বৃদ্ধি

(১৫) নারীর কর্মপরিবেশের উন্নতি সাধন

(১৬) উইড (WID) ফোকাল পয়েন্টের সামর্থ্য বৃদ্ধি

(১৭) স্টাফ ও উপকারভোগী সদস্যদের জেন্ডার প্রশিক্ষণ

(১৮) মহিলা ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

(১৯) পরিবীক্ষণ ছকে জেন্ডার নির্দিষ্ট নির্দেশক এবং নারী-পুরুষের বিভাজিত উপাত্ত সংযুক্তিকরণ

(২০) সংযোগ ও সমন্বয়

(২১) পরিকল্পনা প্রক্রিয়া, ফরমেট ও চেকলিস্ট সংশোধন

(২২) গবেষণা

(২৩) নারী উন্নয়নে জাতীয় মেকানিজম

Dhaka University Institutional Repository

(২৪) জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ

(২৫) উইড ফোকাল পয়েন্ট

(২৬) জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

(২৭) জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ধরণ

(২৮) জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার পরিচালকরা

(২৯) জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার মূল চালকদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও কার্যক্রম

৪.১৬ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সংশোধন

পঞ্চম অধ্যায়:বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন ও সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ক পর্যালোচনা ৯৩-১১২

৫.১ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ

৫.২ সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী: আন্তজার্তিক প্রেক্ষিত

৫.৩ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে নারী

৫.৪ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন

৫.৫ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারীর অংশগ্রহণের সুফল

৫.৬ জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসনের সমস্যা

৫.৭ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইসতেহারে নারী ইস্যু

৫.৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

ষষ্ঠ অধ্যায়:জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনে নারী বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ১১৩-১২৩

৬.১ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে সাধারণ নারী পুরুষের অভিমত

৬.২ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা

৬.৩ গণতান্ত্রিকায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবদান

৬.৪ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ে অভিমত

৬.৫ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচন বিষয়ে অভিমত

৬.৬ জাতীয় সংসদের সধারন আসনে নারী সাংসদ সদস্য নির্বাচনে কোটা পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী এবং সংরক্ষিত নারী আসন

৬.৮ সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে অভিমত

৬.৯ নারী সাংসদ হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলিক যোগ্যতা

৬.১০ নারী স্বার্থ ও নারী বিষয়:

৬.১১ সংরক্ষিত নারী সাংসদদের নির্দিস্ট এলাকা থাকা প্রয়োজন

৬.১২ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সাংসদ ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সাংসদদের বেতনভাতা ও সুবিধাদি

'সপ্তম অধ্যায়:উপসংহার ও সুপারিশমালা- ১২৪-১২৯

পরিশিষ্ট-১

গ্রন্থপঞ্জী ১৩০-১৩৫

পরিশিষ্ট-২

প্রশ্নমালা ১৩৭-১৫৪

সারনী ও চিত্র

১. জাতিসংঘ নারীর ক্ষমতায়ন র‍্যাংকিং প্রথম ১০ টি দেশ ২

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার আমলে মন্ত্রিসভায় নারী সদস্য সংখ্যা ৪২

৩. সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উপস্থিতি ৫৭

৪. জাতীয় সংসদে সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব ১০০

৫. ১৯৭২-২০০১ সাল পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় নারীর উপস্থিতি/প্রতিনিধিত্ব ১০০

৬.১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে সাধারণ নারী পুরুষের অভিমত ১১৩

৬.২ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩. গণতান্ত্রিকায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবদান ১১৬

৬.৪ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ে অভিমত ১১৬

৬.৫ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচন বিষয়ে অভিমত ১১৭

৬.৬ জাতীয় সংসদের সধারন আসনে নারী সাংসদ সদস্য নির্বাচনে কোটা পদ্ধতি ১১৮

৬.৮ সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে অভিমত ১২০

৬.৯ নারী সাংসদ হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলিক যোগ্যতা ১২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়: নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন

১.১ ভূমিকা

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় কোন দেশে নারীর ক্ষমতায়ন কিভাবে ঘটবে এবং কতটুকু ঘটবে। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি যদি অগ্রাধিকার না পায় তাহলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। বাংলাদেশের নারী অধঃস্তনতা সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সকল স্তরে অত্যন্ত ব্যাপক। এর প্রধান কারণ পিতৃতান্ত্রিকতা, পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং বিদ্যমান মূল্যবোধ। এদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে নারী অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও অংশগ্রহণ জেন্ডারভিত্তিক অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের ভেতরে সম্পন্ন হয়।

জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে যে কোনো নীতিমালা তৈরির সময় নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব ও সমঅধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলই হচ্ছে ক্ষমতায়নের প্রধান উৎস ও বিচরণক্ষেত্র। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সরব পদচারণা ইদানীং ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা হয়ে উঠলেও এখনো বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রন খুবই নগণ্য। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে নারীর বিযুক্তির কারণ নিহিত রয়েছে বৈষম্যমূলক আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে। বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন নীতিমালায় নারীর সমঅধিকার ও সমঅংশীদারিত্বের কথা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত থাকলেও প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীকে এখনো দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসেবে দেখা হয় বলেই রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তথা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। ভোটার হিসেবে স্বত:স্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশনিলেও প্রার্থী হিসেবে নারীদের অংশ নিতান্তই নগন্য। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অবস্থাটা কারোর কাম্য নয়।

সাম্প্রতিককালে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান লক্ষণীয়ভাবে বাড়লেও রাজনৈতিক কিংবা জনজীবনে তার প্রতিফলন ঘটেনি এখনও। অথচ আমরা জানি, যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতিই হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল হাতিয়ার। রাজনীতির মাধ্যমেই যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। রাজনৈতিক দল, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, সেখানে নারীর অংশগ্রহণ না থাকার ফলে নারী যেমন তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হচ্ছে তেমনি জেন্ডার-সংবেদনশীলতার অভাব বা পুরুষের আধিপত্য থেকেই যাচ্ছে সকল ক্ষেত্রে। নির্বাচনমূলক রাজনীতিতে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস খুবই নিকট অতীতের। ফলে রাজনীতির প্রক্রিয়ার সকল দিক সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

একেবারেই সীমিত।বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই নারীরা মাত্র বিগত ৩০ বছরের মধ্যে ভোটাধিকার অর্জন করতে পেরেছে। সুইজারল্যান্ডের মতো উন্নত দেশেও নারীরা ১৯৭১ সালে ভোটাধিকার লাভ করেছে। সারা বিশ্বের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ জাপানে যেখানে পুরুষের সমতা অর্জনে নারীকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে , সেখানে প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমির মন্ত্রিপরিষদে পাঁচ জন নারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদও রয়েছে । তবুও জাতিসংঘের ১৮৮ টি দেশের মধ্যে নয়টি দেশের সরকার প্রধান নারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত ৩৮ টি দেশের নেতৃত্ব দিয়েছে নারী (এ্যাছনী গিডেন্স, ২০০৬)[১]।

২০০১ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নারীরা সমগ্র বিশ্বের জাতীয় আইন সভার যৌথ সদস্য পদে রয়েছে ১৪ শতাংশ। সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও ডেনমার্কের মতো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে নারীর সংসদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে (৩৯ শতাংশ) আরব দেশগুলিতে এটা মাত্র ৫ শতাংশ। ইউ,এস কংগ্রেসে ১৩.৮ শতাংশ নারী ১৭৩টি দেশের মধ্যে ৫৭ তম অবস্থানে। যেখানে নারী অধিকারের সাংস্কৃতিক মূল্য রয়েছে সেসব দেশের জাতীয় পরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। এসব দেশগুলোতে নারীরা দীর্ঘদিন ধরে ভোটের অধিকার পেয়ে এসেছে এবং বিভিন্ন পেশায় তাদের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। এসব দেশে সমাজতান্ত্রিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় যারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (কেনওরদি ও মালানি, ১৯৯১)[২]।

জাতিসংঘ নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাংকিং প্রথম ১০টি দেশ, আমেরিকা সহ

র‍্যাংক	দেশ	সংসদে নারী অধিকৃত আসন
১.	নরওয়ে	৩৬.৪
২.	আইসল্যান্ড	৩৪.৯
৩.	সুইডেন	৪২.৭
৪.	ডেনমার্ক	৩৮
৫.	ফিনল্যান্ড	৩৬.৫
৬.	নেদারল্যান্ড	৩২.৯
৭.	কানাডা	৩৬.৬
৮.	জার্মানী	৩১
৯.	নিউজিল্যান্ড	৩০.৮
১০.	অস্ট্রেলিয়া	৩৬.৫
১১.	ইউনাইটেড স্টেটস	১৩.৮

উৎস: ইউ, এন, ডি, পি ২০০২[৩]

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নারীর সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ১০,২৭, (২৮(১), (২) (৩) (৪) এবং ২৯(১) নং ধারায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকটি পর্যায়ে নারী-পুরুষ সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে (গৌতম ২০০৩)। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর প্রবেশাধিকার অনেকটা রুদ্ধ; নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তাদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করানোর অন্যতম একটি পূর্বশর্ত হলো, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। গণতন্ত্র বিষয়ক সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে ঠিক এ কথাই বলা হয়েছে। ওই ঘোষণায় বলা হয়।

"The achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society in which they work in equality and their differences" (Universal declaration of Democracy Cairo, 1997). [৪]

কিন্তু স্বাধীনতার তিন দশকেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান জোড়ালো হয়নি। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম। আর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সীমিত হওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতেও নারীর প্রতিনিধিত্ব নেই। বাংলাদেশের আইনসভায় নারী প্রশ্নে জেন্ডার বৈষম্য রক্ষাকারী কাঠামো বা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনে ইতিবাচক পদক্ষেপ বা সাড়া কখনো লক্ষ্য করা যায়নি (জাহান, ১৯৯৫)[৫]। যদিও নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন আইন সভার মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তথাপি নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ও সংসদীয় প্রক্রিয়ায় নারীদেরকে প্রান্তিক অবস্থানে দমিয়ে রাখার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় (চৌধুরী, ১৯৯৪)[৬] বস্তুত এদেশের রাষ্ট্র স্বয়ং বৈষম্যমূলক তাই মানুষ হিসেবে নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে নারী পৃথকীকরণ ও অধস্তনতা টিকে রয়েছে।

নারী মুক্তির দাবি যদি পাবলিক পরিমন্ডলে নারীর অধিক অংশগ্রহণ হয়, তবে এর অর্থ দাড়ায় বর্তমান ক্ষমতা কাঠামোয় নারীর অন্তর্ভূক্তি। সুদুর অতীতে গৃহস্থালীর বাইরে অর্থনৈতিক উৎপাদন কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততা ছিল এবং তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তা নারী হিসেবে তাদের সমাজ প্রবর্তিত অধস্তনতার পরিবর্তন সাধন করেনি। বর্তমান পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সংখ্যক নারী সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় আসন লাভ করতে পারেন, এমনকি তাদের কিছু সংখ্যক সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পদেও আসীন হতে পারেন, কিন্তু ভূমিকা পরিবর্তনকারী হিসেবে তাদের ব্যক্তিগত সাফল্য নারীমুক্তি সম্বলিত নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার ও ক্ষমতাযন ঘটায় না।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নে মোট পাঁচটি বিষয় চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো, নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। বাকী চারটির মধ্যে রয়েছে: নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করা। সম্মেলনে চিহ্নিত ঐ পাঁচটির মধ্যে বিশ্বব্যাপী কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিমন্ডল নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী দুজনই নারী, তথাপি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোয় নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত।

সাধারণ আসন: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ৩০০ আসন বিশিষ্ট যা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। ২০০২ সালের সংসদীয় নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিরা ১৩টি আসন থেকে জয় লাভ করে এবং ৩০০ আসনের মধ্যে ২ ভাগ প্রত্যক্ষভাবে। ১৯৯৬ সালে ১.৩৬ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ২.৭ শতাংশ, ১৯৮৮ সালে ১.৩ শতাংশ, ১৯৮৬ সালে ১.৭ শতাংশ এবং ১৯৭৯ সালে ০.৮ শতাংশ। এভাবে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সংসদীয় নির্বাচনে দাড়ানো প্রার্থীদের ২ শতাংশের কম ছিল নারী।

সংরক্ষিত আসন: ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫ নং ধারার ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, নারী সদস্যদের জন্য ১৫টি আসন একেবারে আলাদা রাখতে হবে, যে আসনগুলো উপরোক্ত সদস্যদের দ্বারা আইনবলে নির্বাচিত হবে। যাই হোক, ১০ বছরেরও কম সময়েব মধ্যে এ সংখ্যা ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ ৩০-এ পৌছল। সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নারীর সংরক্ষিত আসনগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯৮৮ সালে নারীর জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। ১৯৯০ সালে সংবিধানের ১০ম সংশোধনীর মাধ্যমে আরোও দশ বছরের জন্য ৩০ টি সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করা হলো। এরই ফলশ্রুতিতে ৩০ জন মহিলা প্রতিনিধিকে ১৯৯১ সালের ৩০ মার্চ নির্বাচিত করা হলো। এই অধ্যাদেশ ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে শেষ হয়ে যায়।

বস্তুত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীরা এতো উপেক্ষার শিকার হয়েছে যে, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টিকে অনেকে পুরুষের স্থান দখল বলে ভুল করে বসেন। কিন্তু নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন নিছক স্থান দখলের স্বার্থে নয় বরং রাজনৈতিক জীবনে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করাটাই এখানে মূল যৌক্তিক অবস্থান। রাজনীতিতে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারী সমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যতিরেকে এবং ক্ষমতা কাঠামো থেকে নারীদের বাদ দিয়ে কখনো সত্যিকার

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর রাজনীতিতে নারীদের প্রতিনিধিহীনতা বা ন্যূনতম প্রতিনিধিত্ব কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে না। জনসংখ্যার উভয় অংশের স্বার্থকে সমভাবে বিবেচনা করে নারী-পুরুষ যৌথভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে গতিশীলতা এবং গুণগত মান অর্জন করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও দেখা যায় যে, প্রকৃতি ও জীবনের রক্ষণাবেক্ষণের ঐতিহ্যের দরুন নারীরা রাজনীতির পরিধি বিস্তৃত করার পাশাপাশি ।চলতি রাজনীতির গতি প্রকৃতিকে আরো অনেক মানব কল্যাণমুখী করতে সক্ষম। অন্যদিকে আবার বিশ্বের মেধা, দক্ষতা, প্রতিভার অর্ধেক ভান্ডার সঞ্চিত আছে নারীদের কাছে। তাই এই অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত মানব সম্পদের গোটা মানব জাতির স্বার্থেই জরুরি। একথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণ সংক্রান্ত রাজনৈতিক কাঠামো থেকে নারীদের বাইরে ফেলে রাখলে তা গোটা জাতীয় জীবনকেই অনুন্নত করে রাখে, যা কখনোই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণের সকল স্তরে নারীর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কার্যকর হতে পারে না। সেজন্য রাজনৈতিক জীবনের সর্বস্তরে নারীর যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রচলিত রাজনীতিকে আরো গণমুখী, কল্যাণকর ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক করার জন্য আমাদের সকলকে অব্যাহত প্রয়াস চালাতে হবে। সামগ্রিক বিবেচনায় শুধু নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হলে চলবে না। দরকার দেশ পরিচালনার রাজনীতিতে নারীর সমঅংশগ্রহণ ও সমঅংশীদারিত্ব। আর নির্বাচনী ইশতেহারের পাশাপাশি এই বিষয়টি সুস্পষ্ট থাকতে হবে রাজনৈতিক দলের নীতিগত ও আদর্শগত অবস্থান এবং গঠনতন্ত্র নীতি এবং আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাঠামোগত এবং পদ্ধতিগত দিকগুলো তুলে ধরা হয়। নারীকে রাজনীতির সমঅংশীদার করতে হলে একদিকে যেমন নারীর জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে অন্যদিকে তাদের দায়দায়িত্ব দিতে হবে। থাকতে হবে দল ও নেতৃত্বেও ইতিবাচক মনোভাব। নারীদেরকে নেতৃত্বে নিয়ে আসার জন্য তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক দলসমূহে গড়ে তুলতে হবে নারীবান্ধব পরিবেশ। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী সমাজকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সমঅংশীদারিত্বের বাইরে রেখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা বা সুশাসন এবং টেকসই উন্নয়ন কোনোটাই সম্ভব নয়।

১.২ গবেষণার বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব

আদর্শ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ সম্পূর্ণরূপে ঘটেনি। জাতীয় সংসদ প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এটি সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদন করতে পারেনি। সংসদকে কার্যকর করা খুব কঠিন

Dhaka University Institutional Repository

কাজ। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐক্যমত, সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এটা সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদকে সাফল্যজনকভাবে কার্যকরী করার জন্য আমাদের সংসদীয় সংস্কৃতির বিশেষ প্রয়োজন। সংসদে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা নিশ্চিত না হলে কোন তাৎপর্যপূর্ন রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী সাংসদ, নারী নেত্রী এবং সাধারণ জনগণের উপর চালিত গবেষণায় এমন কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য বেরিয়ে আসবে যা বাংলাদেশের গণতন্ত্রে উত্তরনে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আলোচ্য গবেষণায় দেখানো হয়েছে সংরক্ষিত ব্যবস্থা কিভাবে উন্নয়নে নারী সম্প্রদায়কে সহায়তা করে রাজনীতিতে ও জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এই গবেষণাটি সরকার, রাজনৈতিক দল, নারী সংগঠন ও নারী কর্মীদের জন্য সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। এটি সংরক্ষিত ব্যবস্থা, সংরক্ষিত আসন সংখ্যা, ভোট প্রক্রিয়া ও প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা পর্যালোচনা করা

২. নারীদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

৩. সংরক্ষিত আসনে নারী সাংসদগণ শুধুমাত্র 'নারী' হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করলে আইন সভায় নারীস্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হয় তা নিরুপন করা।

৪. জাতীয় সংসদে নারী আসনের প্রতিনিধিদের মর্যাদা, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা।

৫. গতানুগতিক রাজনৈতিক কাঠামো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর নির্মিত হওয়ায় নারীর দৃশ্যমান অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কতটা ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করা।

৬. নারী উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মূল্যায়ন করা।

৭. তৃণমূল পর্যায়ে নারীর সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব গঠন

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

আলোচ্য গবেষণায় জরীপ পদ্ধতিতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। Close ও open-ended উভয় ধরণের প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। open-ended প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে উত্তরদাতারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। প্রাথমিক তথ্য ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সেকেন্ডারী সাহিত্য ও গবেষণা প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক প্রবন্ধ, 'নারী ও সংসদের' উপর বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য ইত্যাদি বিষয়। সংগৃহীত তথ্য পরিমার্জন পরিবর্ধন করে টেবিল আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রত্যেকটি গবেষণায় কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে,এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণায়ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে ।প্রথমত জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন বিষয়ে ইতোপূর্বে তেমন কোন গবেষনা হয়নি। এ বিষয়ে সাহিত্যের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে.এছাড়া তথ্য সংগ্রহে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন একটি সংবেদনশীল অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেকেই তাদের নিজ নিজ দলীয় অবস্থার কারনে। অর্থনেতিক সীমাবদ্ধতার কারনে এ গবেষণাটি ব্যাপক পরিসরে করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. Giddens Anthony, Essentials of sociology, Norton 2006.

২. Kenworthy, Lane and Malami, Mellisa, 1999, "Gender inequality in political representation. A worldwide comparative analysis" Social Focus, Vol. 78, No. 1.

৩. United Nations Development program,2002

৪. Universal declaration of Democracy cairo, 1997.

৫. Jahan Rounaq "Bangladeshi women facing 21st century" paper presented in a seminar of BIISS, Dhaka 1995.

৬. Chowdhury Najma, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন, প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা" Dhaka 1994.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক ধারণা; নারী, রাজনীতি, ক্ষমতায়ন,ও সংবিধান

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তাত্ত্বিক ধারণা; নারী, রাজনীতি, ক্ষমতায়ন,ও সংবিধান

২.১ নারী

নারী প্রশ্নে দার্শনিকদের মধ্যে সৃষ্ট বিতর্কে দু'ধরণের বিশ্লেষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এক. মতাদর্শিক এবং দুই, বস্তুবাদী। পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ নারীকে প্রাকৃতিকভাবে দুর্বল ও নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করে অরাজনৈতিক ও ক্ষমতাহীন গৃহের অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। এমতাবস্থায় আইনের সংস্কার করে নারীকে গৃহের বাইরে নিয়ে এলেও দেখা যায় পাবলিক ক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষমতা কেবল আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পুরুষদের বস্তুগত ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করে। মতাদর্শিক প্রবলতার সঙ্গে বস্তুগত প্রাচুর্যের মিলনে পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতা পুনরুৎপাদিত হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরুষের রাজনীতি এভাবে সার্বজনীনতা লাভ করে। মতাদর্শিকভাবে অধস্তন হয়ে ও আর্থ-সামাজিকভাবে ক্ষমতাহীন হয়ে কেবল ভোট ও আইনের কাগুজে অধিকার নিয়ে নারীর পক্ষে পুরুষের ক্ষমতার দুর্গে আঘাত হানা অসম্ভব।। তাছাড়া আঘাত করার জন্য নারীর কোনো রাজনীতিও নেই। এ ধরনের উপলব্ধি থেকে নারী প্রশ্নে নতুন চিন্তাধারা উপস্থাপন করেন নারীবাদী দার্শনিকগণ।

সিমন দ্যা বুভোয়ারের মূল প্রশ্ন দুটি। এক. কেন নারীর স্থান সব সময় পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে অধস্তন হিসেবে ধরা হয়। দুই. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী কেন অদৃশ্য কিংবা প্রান্তিক অথবা 'সেকেন্ড সেক্স'। এই আলোকেই জিজ্ঞাসা- নারী কি সত্যিই টিকে আছে? নারীর কি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে? থাকলে নারীর সমস্যা কি এর উত্তর দিয়েছেন সিমন দা বুভোয়ার, 'কেউ নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন না, নারী হিসেবে তৈরি হয়।' নারীদের গুণাবলি, নারীর জন্য নির্ধারিত মর্যাদা, তার জৈবিক পরিচয়ের গুরুত্ব, অবমূল্যায়নের মতাদর্শ সব কিছু শেখার মাধ্যমেই নারী আত্মপরিচয় লাভ করেন। প্রাকৃতিকভাবে নয় সামাজিক নির্মাণের মধ্যে নারী একটি শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠে। এই নির্মাণে পুরুষের ভূমিকাই প্রধান। পুরুষ কখনো নিজের সম্পর্কে কল্পনা করে না।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে তাদের অবদান উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু আজকের বিশ্বে নারীর অবস্থান পুরুষের সমান নয়। নারীরা অধিকাংশ সময় নিজের পরিবারের পুরুষদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রচলিত সমাজ কাঠামোকে মেনে নেন এবং নীরব থাকেন। অধিকাংশ সময় নীরব নারী মূর্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নারীদের বা পরিবারের স্বার্থে আঘাত এলে তা যে শক্তিশালী ভাষায় পুরুষদের বিরুদ্ধে ও সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেন তা খুবই কম উদঘাটিত হয়।(জাহাঙ্গীর ১৯৮৬)[১]

Dhaka University Institutional Repository

নারী সমস্যাসমূহের প্রতি খুব কম দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জেন্ডার ভিত্তিক বিভাজন এবং সামাজিকভাবে অধস্তনতা বশতঃ জীবনের সবক্ষেত্রে- তা সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক কিংবা সামাজিক হউক না কেন -নারীদের এ মর্যাদা নিম্ন থেকে নিম্নতর পর্যায়ে পৌছেচে । এই বৈষম্যের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। বাংলাদেশ হলো এরূপ নিম্ন পদমর্যাদার জ্বলন্ত উদাহরণ এবং নারী সম্পর্কিত সর্বপ্রকার বৈষম্যের রুপ এখানে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশে নারীর মতাদর্শগত ভূমিকা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নারীর সর্বজনীন অধস্তনতার ধারণা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্যনীয়। পাশ্চাত্যের চিন্তা ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গবেষকগণ প্রকৃতি-কৃষ্টি নারী-পুরুষ ব্যক্তিগত-পাবলিক বিষয় এ ধরণের দ্বন্দ্বমুলক ধারণা নারী প্রশ্নের বিশ্লেষণে প্রয়োগ করে থাকেন।(নাসিমা আখতার,১৯৮৬)[২]

যদিও ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে, তবুও বাংলাদেশের নারীরা পিছিয়ে পড়ছে এবং নারী ইস্যুগুলো সাম্প্রতিক সময়ে উন্নয়নের প্রধান ধারা কিংবা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

পাক–ভারত উপমহাদেশের নারীরা সর্বদাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক শোষন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে, যদিও বাংলাদেশের নারীরা স্ব-সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিল (খান ২০০২,)[৩]। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত অনেক দেশের মতো দারিদ্র হলো বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর অন্যতম। এসব দারিদ্রগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠি হলো নারী।

যে কোন উন্নয়ন পদক্ষেপের মধ্যে অবশ্যই নারীর উন্নয়ন প্রয়োজন, কারণ তারা বস্তুত জাতির নির্মাতা। কেবল মাত্র একজন শিক্ষিত, সচেতন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মাতা অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ সন্তান লালন করে ভাল নাগরিক উপহার দেওয়ার মাধ্যমে জাতিকে সাহায্য করতে পারেন।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং নারী বিষয়ক কিছু নীতি বাস্তবায়ন করেছে। কিন্তু সর্বোপরি ঐসব নীতি খুব একটা সাফল্যজনক হয়ে উঠেনি। ১৯৭৫ সালে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়। যদি আমরা বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি দেই, তবে আমরা দেখতে পাব যে, পক্ষত অর্থেই নারী ইস্যুগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এখানে একটি বিশেষ জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে এবং জাতীয় উন্নয়নের Integral অংশ হিসাবে নারী উন্নয়নকে সম্পর্কিত করার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে । অতএব এটি পরিষ্কার যে, নারী এজেন্ডা ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আলোচনা করা হয়নি এবং নারীর চোখ দিয়ে দেখা হয়নি, বাংলাদেশের মতো

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নশীল দেশের বাস্তবতা হলো ডোনার, উন্নয়ন এজেন্সি এবং আন্তজার্তিক নেতৃবর্গের চাপে নারী ইস্যুগুলো অন্ততঃপক্ষে কাগজে কলমে স্থান পেয়েছে।

কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এসব উদ্যোগ সত্বেও বাংলাদেশের বেশিরভাগ নারীই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়নি।

নারী উন্নয়ন দশক (১৯৭৬-১৯৮৫) এবং বিশ্বব্যাপী নারী কর্মীদের এ্যাডভোকেসি আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করতে উৎসাহিত করেছে । ৭০ ও ৮০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের জন্য বড় বড় উন্নয়ন পদক্ষেপ ছিল নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের উপর- দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, নিরাপদ খাবার পানি, পরিবার পরিকল্পনা, কন্ট্রাসেপটিভের ব্যবহার এবং নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা গত প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশের নারীকে শাসন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে সমাজ ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। ফলে নারী যেমন তার নিজ অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হয়েছে তেমনি অবস্থানগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বাংলাদেশের নারীর অবস্থান এখনও প্রান্তিক। নারীর এই প্রান্তিকতা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই। রাষ্ট্রীয় নীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় আইন অনুযায়ী যেমন নারীকে কম অধিকার দেওয়া হয়েছে তেমনি পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক গঠন প্রক্রিয়ায় পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের কারণে নারীর অধস্তনতা বিরাজ করছে। তদুপরি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সম্পদের অসম বণ্টন, মানব অধিকার লঙ্ঘন ও আইনের অনুশাসনের অভাব প্রভৃতি কারণেও নারী রাষ্ট্রের শাসন ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়।

প্রকৃত অর্থে নারীর স্বাধীনতা বা উন্নয়ন সেই দেশের সুষ্ঠু শাসন প্রক্রিয়ার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নীতির মাধ্যমে নারীকে যে অধিকার বা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নারীর উন্নয়ন নিশ্চিত করে। ফলে 'গুড গভর্ন্যান্স' বা সুশাসনের বিভিন্ন উপকরণসমূহ বাংলাদেশে কতটুকু কার্যকর তার উপরই নির্ভর করে বাংলাদেশের শাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান। সুশাসন কায়েম না হলে রাষ্ট্রের মতাদর্শ ও নীতিমালার সাথে বাস্তবতার বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল পদক্ষেপ বা উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ ক্ষমতায়ন বলতে কি বুঝায়

ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান বা একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধা-বিপত্তি, প্রতিস্কন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়। বিশেষত ক্ষমতায়ন হল সিদ্বান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। এর জন্য দরকার আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস।

২.৩ নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের অভিমত

(১). Caroline Moser-এর মতঃ ক্যারোলিন মোজারের ক্ষতায়নের ধারণাটি হলো ক্ষমতার পুনবন্টনের কেন্দ্রীয় উপায় হিসেবে সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণসহ ব্যক্তির উপর আলোকপাত। মোজার (১৯৮৯,১৮১৫)[৪] ক্ষতায়নকে বিবেচনা করেছেন "an ability to enhance women's self confidence and internal streangth" এখানে পছন্দের অধিকার বিষয়টি যুক্ত এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রন অর্জন এবং পরিবর্তনের দিককে প্রভাবিত করে। তিনি আরোও বলেন, মনস্তাত্বিক ক্ষমতায়ন যা আত্মমর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে গঠিত তা অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং নারীদেরকে তাদের পারিপার্শ্বিকতা, পরিবার ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনয়নে নারীদেরকে সহযোগিতা করে। আভ্যন্তরীন প্রতিবন্ধকতা (নারীর ভগ্নস্বাস্থ্য, শিক্ষার অভাব) তাদের সত্যিকার স্বাধীনতার পক্ষে অন্তরায় হিসাবে দাড়ায়। কিন্তু এগুলোকে গোষ্ঠীগতভাবে sort out করা যায় কারণ নারীর সুনির্দিষ্ট স্বার্থকে পুনরায় রুপ দিতে হবে যাতে করে পরিবার সিভিল সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারীর অধস্তন মর্যাদাকে রুপান্তরিত করা যায়।

(২) Joe Rowlands এর দৃষ্টিভঙ্গিঃ Rowlands -এর মতে ক্ষমতায়ন হবে "a process whereby women become able to organise themselves to increase their own self. Reliance, to their independent right to make choices and to control resources which will assist in challenging and eliminating their own sub-ordination" (Rowlands, 1977, 17). ৬ ক্ষমতায়নের মূল বিষয়টা হলো ক্ষমতা যা চারটা রুপ হতে পারে power over' 'Power to' Power with' and 'Power within' । এখানে Power over অর্থ ক্ষমতার নিয়ন্ত্রন, Power to অর্থ উৎপাদনশীল ক্ষমতা যা কর্তৃত্বহীন নূতন নূতন সম্ভাবনা ও কার্যাদি তৈরি করে। Power with অর্থ সম্পর্কগত ক্ষমতা এবং এটি এর অনুশীলনের মধ্যে অবস্থান করে। Power within অর্থ একজনের আত্মনির্ভরশীলতা এবং আত্মমর্যাদা। ব্যক্তি ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত Rowland-এর মত হলো পুরো ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যান ধারণা বলবৎ রাখা। এটি মনস্তাত্বিক, মনোসামাজিক প্রক্রিয়া ও পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে কথা বলে। তার মতে, ক্ষমতায়ন হলো একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং এর লক্ষ্য হলো নিয়ন্ত্রণের অধিক স্থান খুঁজে বের করা। এটি পরিবর্তনসমূহকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করে- ব্যক্তিগত, সম্পর্কগত এবং সংঘবদ্ধ।

(৩) Prices-এর মত: J. Price (১৯৯২)[৭] বলেন যে, ক্ষমতায়নের লক্ষ্য ব্যক্তির বিকাশ ও উন্নয়নের বাইরে বিস্তৃত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি সচেতনতা তুলে ধরে এবং নারীদেরকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে যা স্বাভাবিকভাবে ম্যাক্রো পর্যায়ের ব্যবস্থা ও কাঠামোকে প্রভাবিত করে। এগুলো হলো ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার বিশেষ লক্ষ্য। এখানে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে সরে আসার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

(৪) John Friedman-এর মত:[৮] বিকল্প উন্নয়ন বিষয়ক Friedman-এর তত্ত্বটি ক্ষমতায়নের প্রত্যয় থেকে গৃহীত যা সমাজের আদিবাসী ও সামাজিক সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। তার মতে, তিন ধরণের ক্ষমতা আছে- সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্বিক। সামাজিক ক্ষমতা জ্ঞান তথ্য ও দক্ষতা নিয়ে গঠিত, এসবই চূড়ান্তভাবে গৃহস্থ উৎপাদনের অগ্রগতি সাধনে সহযোগিতা করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা তৈরিতে সহযোগীতামূলক। রাজনৈতিক ক্ষমতা হলো এমন পদ্ধতি যা ম্যাক্রো ও মাইক্রো পর্যায়ে নীতি পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। এটি কথা বলা এবং সংঘবদ্ধ কাজের ফল। চূড়ান্তভাবে মনস্তাত্বিক শক্তি পটেন্সির ব্যক্তি উপলব্ধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যা আত্মনির্ভরশীল ব্যবস্থার আত্মনির্ভরশীলতা ও বর্ধিত আত্মমর্যাদার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ফ্রাইডম্যান ক্ষমতায়নকে ব্যাখ্যা করেছেন সামাজিক শক্তি হিসেবে যা রাজনৈতিক ক্ষমতায় রুপান্তর করা যায়। নারীরা রাজনৈতিক দাবি দাওয়া করতে পারে যার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক আইনগত পরিবর্তন। উপরোন্ত সামাজিক নেটওয়ার্কিং তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে যা অবশেষে মনস্তাত্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে শক্তি যোগায়।

(৫) Kate Young এর মত: Kate Young এর মতে, ক্ষমতায়ন নারীকে অক্ষম করে তোলে- "to take control of their own lives, set their own agenda, organize to help each other and make demands on the state for support and on the society itself for change" [৯] ক্ষমতায়নহলোপ্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন যা সমাজের নারীর নিম্নতর মর্যাদার জন্য দায়ী। এটি transfer makes সম্ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত যা নারীব অবস্থানকে এমনভাবে পরিবর্তন করে যাতে অগ্রগতি টেকসই হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Each step taken in the directs of gaining greater control over their lives will focus on their needs other than contradictions to be resolved in turn (1993: 157). [১০] ফলে এটি সমাজে নারীর ক্ষমতা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহের উপর প্রভাব ফেলবে। Young-এর মতে, নারীরা বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং ঐক্য তৈরি করতে পারে যদি প্রয়োজন হয়। এভাবে, Young ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে বৃহত্তর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি বৃদ্ধি করে গোষ্ঠী কাজের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন।

২.৪ নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

(১) উদারনৈতিক নারীবাদ

নারীবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে প্রাচীন ধারা হল উদারনৈতিক নারীবাদ বা লিবারেল ফেমিনিজম। আন্দোলনের এ ধারা ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীতে শক্তিশালী আকার ধারণ করে। ফরাসি বিপ্লবের আগে পর্যন্ত নারীর অধিকার কাল্পনিক রূপে ছিল। সামন্তীয় প্রথা ভেঙে বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা প্রথম বাস্তবে রূপ পায়। মানব স্বাধীনতার ধারাবাহিকতায় সমাজসহ সর্বপ্রকার পুরুষতান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে নারী আন্দোলন বিকশিত হয়। এ ধারার প্রধান কর্মসূচি হচ্ছে পুরুষের সমান নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। উদারনৈতিক নারীবাদীদের মূল দাবি হচ্ছে ভোটাধিকার, বাক স্বাধীনতা, নির্বাচন ও রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পুরুষের মত সমান সুযোগ অর্জন করা। পাশাপাশি তারা সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর অধিকার সমতার ভিত্তিতে নির্ধারণের দাবিতে সোচ্চার। নারীবাদের অন্যান্য ধারার আন্দোলনকারীরা তাদের কয়েকটি বিষয় নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে থাকে। প্রথমত, তারা জেন্ডার বৈষম্যের বিরুদ্ধে কখনো অবস্থান গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়ত, উদারনৈতিক নারীবাদ বিদ্যমান সমাজ কাঠামো অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে। অর্থাৎ, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন অনিয়মকে চ্যালেঞ্জ না করেই তারা আন্দোলন পরিচালনার নীতিকে যথার্থ মনে করে। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আন্দোলনের এ ধারা নারী অধিকারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কেননা, এর মাধ্যমে বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। মেরি ওলস্ট্যানক্র্যাফট, জন স্টুয়ার্ট মিল, বেটি ফ্রাইডান, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ উদারনৈতিক নারীবাদের প্রবক্তা।

(২) মার্কসীয় নারীবাদ

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের মতাদর্শকে ভিত্তি করে এ ধারার উদ্ভব। তবে এখানে শুধুমাত্র মার্কসের অবদান বললে ভুল হবে। নারী অধিকার প্রশ্নে তার সহযোদ্ধা ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের

Dhaka University Institutional Repository

অবদান ইতিহাসে অনস্বীকার্য। সাধারণত, মার্কস এবং এঙ্গেলসের যৌথ চিন্তা পদ্ধতিকে মার্কসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মার্কসীয় চিন্তার আলোকে নারী অধিকার আন্দোলনের ধারাকে মার্কসীয় নারীবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের একটি বই যথেষ্ট আলোচনার দাবি রাখে। বইটি হচ্ছে 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'। বর্তমান সময়ে নারী বিষয়ে যে কোন গবেষণা কর্মে বইটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে নারী কোন প্রক্রিয়ায় পুরুষের পদানত হয়েছে, সে ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এঙ্গেলসের বইটি ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।

মার্কসীয় নারীবাদে শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে নারীর পরাধীনতার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ধারা অনুসারে, নারীর পরাধীনতা শুরু হয়েছে দাস প্রথারও অনেক পূর্বে। নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়ের ক্ষেত্রে তার শরীর কোন ভূমিকা পালন করেনি। এঙ্গেলস বলেছেন, মাতৃপ্রধান সমাজ অবসানের পর যাবতীয় সম্পত্তি ও নারীর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের অন্যান্য উৎপাদনের মত নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ফলে এ ধারার নারীবাদীদের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা বিলুপ্তির পর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী মুক্তি সম্ভব। এর কারণ হিসেবে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, নিছক কতকগুলো অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে, কর্মসংস্থানের সমান অধিকার কখনো নারীর চাকরি ও সমান বেতনের নিশ্চয়তা দেয় না। মার্কসীয় নারীবাদের আন্দোলন পুরুষদের বিরুদ্ধে নয়। এ ধারার প্রধান কর্মসূচি হচ্ছে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা। তাদের মতে, এ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকার আদায় সম্ভব। কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, ক্লারা জেটকিন, ভ্লাদিমির লেনিন, আলেকজান্ডার কোলনতাই প্রমুখ মার্কসীয় নারীবাদকে শক্তিশালী অবয়ব দেন।

(৩) র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ

বিংশ শতাব্দীর ৬০-এর দশকে পাশ্চাত্য র‍্যাডিকাল ফেমিনিজমের উদ্ভব। র‍্যাডিক্যাল ধারার কর্মীরা নারীর পুনরুৎপাদন বা প্রজনন ক্ষমতাকে অস্বীকার করে থাকে। তাদের মতে, সন্তান লালন ও সাংসারিক কর্মকাণ্ড নারীকে পুরুষের অধীনস্থ রাখে। এ নারীবাদের মূল কথা হল, পুরুষ নারীকে লৈঙ্গিক পীড়নের মাধ্যমে শোষণ করে। পুরুষের শারীরিক ক্ষমতা, আগ্রাসী মনোভাব ও নির্যাতনের ক্ষমতা নরী নিপীড়নে মদদ দেয়। তারা নারী নিপীড়নকারী পুরুষকে শ্রেণী শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ক্ষমতা, সর্বব্যাপী, রাজনীতি মানেই ক্ষমতা। সুতরাং রাজনীতি সর্বব্যাপী। এভাবে ব্যক্তিগত

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ও রাজনীতির আওতাভুক্ত। রাজনীতিই সবকিছুর কারণ। ক্ষমতা সকল সম্পর্ক নিরুপন করে। ব্যক্তিগত বিষয়াবলী রাজনীতির বিষয় ,কারণ ব্যক্তিগত বিষয়েও ক্ষমতা সম্পর্ক ক্রিয়াশীল।(কেট মিলেট, ১৯৭০)।[১১]

ফলে, র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিজম পুরুষদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্নে বিশ্বাসী। এ ধারার মতে, পিতৃতন্ত্রের পাশাপাশি বিয়েসহ পুরুষের সাথে সমস্ত সম্পর্ক বিলোপের মাধ্যমেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নারীরা কেবল নারীদের সাথে একত্রিত হয়ে নতুন নারীকেন্দ্রিক দুনিয়া গড়ে তোলার মাধ্যমে শোষণের অবসান করতে হবে।. নারীত্বকে মহামান্বিত করার জন্য নারী জন্মকে উৎসবে পরিনত করার বদলে নারীর উচিত যৌন পরিচয় বাতিল করা। (উইটিগ ১৯৭৯, মার্জ পিয়ারসি, ১৯৭৮)[১২]। র‍্যাডিক্যাল প্রবক্তাদের মতে, মাতৃত্বের দায় গ্রহণ করায় নারীরা পুরুষের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়েছে। তাই তারা উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে মাতৃগর্ভের বাইরে সন্তান জন্মদানের পক্ষে। জৈনিক চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে এরা সমকামে বিশ্বাসী। বর্তমান পরিবার প্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন লালন করে থাকে।

(৪) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ

র‍্যাডিক্যাল ও মার্কসীয় নারীবাদের এক ধরনের মিলিত রূপ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ। সমাজ ও ইতিহাস ব্যাখ্যায় মার্কসবাদী পদ্ধতি এরা গ্রহণ করলেও নারী মুক্তি প্রশ্নে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে। তাদের মতে, নারী অধিকার আদায় শুধুমাত্র সর্বহারা বিপ্লবে সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাঠামোকে নারী নিপীড়নের মূল কারণ হিসেবে শনাক্ত করেছে। তাদের মতে জৈবিক পার্থক্য নয়, নারী-পুরুষের মধ্যে গড়ে উঠা সামাজিক সম্পর্কই নারীর মর্যাদাহীনতায় দায়ী। . গার্হস্থ্য শ্রমে নিয়োজিত একজন স্ত্রী গৃহে মজুরী ছাড়া যে কাজ করেন এবং তার স্বামী গৃহের বাইরে মজুরীর বিনিময়ে যে কাজ করেন এই দুই কাজের ব্যয়কৃত শ্রমঘন্টাই হচ্ছে স্বামীর জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমঘন্টা। (সিলভিয়া ফেডারিসি, ১৯৭৪)[১৩]।আর তাকে পিতৃতন্ত্র পাকাপোক্ত করেছে। এ ধারার যুক্তি অনুযায়ী, যৌন শোষণ পুঁজিবাদের আগে যেমন ছিল তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়ও থাকতে পারে। কারণ, সম্পদে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব প্রবল মাত্রায় থাকতে পারে। তাদের মতে, একমাত্র পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্তির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) সাংস্কৃতিক নারীবাদ

সাংস্কৃতিক নারীবাদের মতে, জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণা সামাজিক এবং ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তা নিশ্চিতভাবে পরিবর্তনযোগ্য। নারী-পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যজনিত কারণ নয়, মনস্তাত্ত্বিক গড়নই নারী অধীনস্ততার মূল নিয়ামক। একজন নারী ও পুরুষকে লৈঙ্গিক পরিচয় অনুযায়ী সমাজ নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আচার-আচরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি শেখায়। অর্থাৎ, ছোটবেলা থেকে প্রত্যেককে সামাজিক বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট আচরণে অভ্যস্ত করানো হয়। তাই সংস্কৃতিবাদীরা নারী মুক্তি প্রশ্নে সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের উপর জোর দেয়। সাংস্কৃতিক নারীবাদীরা অনেকাংশে র‍্যাডিক্যালদের বিপরীতে অবস্থান করে। তাদের মতে, শারীরিক বাস্তবতা নারীকে কতকগুলে নারীবাদী বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন অপরের জন্য ভাবনা, মমতা, সহনশীলতা, নমনীয়তা, মাতৃত্ব ইত্যাদি। তাদের মতে, এসব সংস্কৃতি কাঙ্ক্ষিত এবং তা সমাজের প্রয়োজনে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। এ নারীবাদ কখনো মাতৃত্বকে অবমূল্যায়ন ও ধ্বংস করার পক্ষপাতী নয়।

(৬) পরিবেশ নারীবাদ

পরিবেশ নারীবাদের মূল বক্তব্য হল নারী ও পরিবেশ উভয়ে পিতৃতান্ত্রিক আগ্রাসনের শিকার। পুরুষতন্ত্র এই দুই গোষ্ঠীকে হাজারো বছর ধরে শোষণ করে আসছে। সভ্যতার শুরু থেকে পুরুষরা জীবনের স্রষ্টা ও রক্ষকরূপে প্রকৃতি এবং নারীর উপর ভূমিকা রেখে চলছে। বর্তমান প্রচলিত উন্নয়ন ধারা এ আগ্রাসনকে আরো বিস্তৃত করেছে। তাই এই নারীবাদ নারী ও প্রকৃতির উপর বিদ্যমান পুরুষ প্রাধান্যের অবসানের দাবি করে। পরিবেশ নারীবাদের প্রবক্তা হিসেবে ভারতের বন্দনা শিবা, মারিয়া মিজদের নাম উল্লেখযোগ্য।

(৭) বৈশ্বিক নারীবাদ

এই ধারা নারীর অবস্থানকে বৈশ্বিকভাবে দেখার দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। কেননা, কেবল নির্দিষ্ট এক দেশে নয়, নারীরা দুনিয়ার সর্বত্রই দরিদ্র ও নিপীড়িত। বিভিন্ন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নারীর অর্থনৈতিক ও পুনরুৎপাদন শ্রমকে আত্মসাৎ করে। সে জন্য তারা মনে করে, ওই সমস্যা দূর করতে একটি বৈশ্বিক সাপোর্ট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। যেখানে প্রতিটি সমাজের নারীরা তাদের সমস্যা যথাযথ চিহ্নিত করার ক্ষমতা অর্জন করবে। এই প্রক্রিয়ায় নারী সহজে সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ আইনসভায় নারীর তাত্ত্বিক ধারণা

(১) গণতন্ত্র ও নারীবাদ

নারীকে ব্যক্তিসত্তা হিসেবে গণ্য করা ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও নারীবাদের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সকল নাগরিক একই আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার পায় এবং সমতা বিরাজ করে। রাষ্ট্রে লিঙ্গ, মর্যাদা, সম্পদ ও জাতিভেদে সকল নাগরিক সমান। কাজেই সামাজিক এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যা 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্যক্তি হিসেবে মানুষের অধিকার সংক্রান্ত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শ নারীবাদে সম্প্রসারিত হয়ে আরো বাস্তবসম্মত হয়েছে। নারীবাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে জৈবিক পরিচয় ছাপিয়ে মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা কোনো কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয়। এখানে যুক্তি হলো রাষ্ট্র নারী জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন- সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে এবং নারীকেও সমান শাস্তি ভোগ করতে হয়। এভাবে রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী একজন বিমূর্ত ব্যক্তি। একজন নারী যখন নাগরিক তখন তার সাথে আচরণে রাষ্ট্র প্রচলিত গণতান্ত্রিক নীতি-রীতি লংঘন করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় আইনপ্রণয়নে নারীর কোনো ভূমিকা না থাকলে তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করা অযৌক্তিক। রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত সমান সুযোগ লাভকারী এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে নারীর অধিকার সীমিত করা রাষ্ট্রের পক্ষে আইনসিদ্ধ নয়। সুতরাং নারীদের লিঙ্গের পরিচয়ে নয় বরং মানুষ হিসেবে পরিচয়ই তার রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে শাসিতের সম্মতিই ক্ষমতার ভিত্তি রচনা করে থাকে (মার্টিনাউ, ১৯৯৬)। অতএব নারী অধিকার সীমিত করা বা তাদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার কোনো যুক্তি নেই। নারীবাদী চিন্তাবিদগণ জেন্ডার সমতার মতো সমতাবাদী নীতিসমূহকে সামাজিক বাস্তবতায় পরিণত করার পক্ষপাতী। তারা বলেন, সমতার অর্থ এই নয় যে, নারী পুরুষ প্রাকৃতিকভাবে সমান। তবে তাদের যুক্তি হচ্ছে নারী ও পুরুষের পৃথক পরিচয় সামাজিকভাবে নির্মিত। এভাবেই নারী ও পুরুষকে পাবলিক ও প্রাইভেট পর্যায়ে দু'টি পৃথক সত্তা হিসেবে পৃথক মূল্যবোধ ও পদসোপানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গণতন্ত্রে লিঙ্গ বিষয়ক এ তত্ত্ব ও নাগরিকদের জন্য সমতার ফর্মুলা অন্তর্নিহিত পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে সম্ভবপর নয়। এভাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। নারীবাদের বক্তব্য হচ্ছে নারী ও পুরুষকে ব্যক্তি হিসেবে সমান হতে হলে প্রয়োজন লিঙ্গগত পরিচয়ের অবসান এবং সকল প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির বাইরের ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ (পেটম্যান, ১৯৯০)[১৪]। এতে পাবলিক পরিসরের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য ও প্রাইভেট পরিসরের সংকীর্ণ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য অপসারিত হয়। নারীবাদী ডিসকোর্স পিতৃতন্ত্রের বিপরীতে এ দুই পর্যায়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে লিঙ্গীয় নিরপেক্ষ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) গণতন্ত্র এবং পিতৃতন্ত্র

লক্ষ্য করা যায় যে, পিতৃতান্ত্রিক ডিসকোর্স পুরুষ ও নারীর জন্য দুটি আলাদা ক্ষেত্র নির্মাণ করে। এ ব্যবস্থা নারীর অধস্তনতা ও পুরুষের উচ্চ মর্যাদা নির্দেশ করে এবং পুরুষকে নারীর রক্ষক হিসেবে দাঁড় করায়। যেহেতু পিতৃতন্ত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্রের নীতিসমূহকে অগ্রাহ্য করে সেহেতু পিতৃতন্ত্রের অধীনে গণতন্ত্র সমস্যাসংকুল হয়। পিতৃতন্ত্রে সার্বজনীন দাবিকে সীমিতকরণ করার প্রবণতা রয়েছে এবং এভাবে নারী অধিকারকে বিশেষ দাবিতে পরিণত করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশে নারী অধিকার বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, নারীর অবস্থান উন্নয়নে, সন্তানদের শিক্ষাদানে, পারিবারিক কাজে দক্ষতা সৃষ্টিতে এবং পাবলিক পরিসরে প্রতিনিধিত্বের জন্য নারীর মানবাধিকার প্রয়োজন। এতে কিন্তু নারীকে 'নারী' হিসেবেই চিহ্নিত করা হয় 'মানুষ' হিসেবে নয়। নারী-পুরুষের স্বার্থ এভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, নারীবাদ পাবলিক-প্রাইভেট পার্থক্য বা লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রম বিভাজন অবসানের পক্ষপাতী। এভাবেই উক্ত দু'টি পর্যায়ে নারী-পুরুষের ভূমিকায় পার্থক্য দূর হয়ে যায়। নারীবাদ পৃথকীকরণের বিপরীতে মানবকুলের সমতা দাবি করে। তাই নারী যখন অধিকার চায় তখন তা পুরুষ প্রতিপক্ষের সমান অংশীদার হিসেবে।

পিতৃতন্ত্রে রাষ্ট্রকে সার্বজনীন মানব স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয় বরং নারী-পুরুষের পৃথক স্বার্থ রক্ষার যন্ত্রে পরিণত করে। এ ব্যবস্থায় মানুষ বা নাগরিক হিসেবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষের প্রতিবন্ধকতা প্রমাণ করে যে, পুরুষরাও গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিমূর্ত ব্যক্তি হতে ব্যর্থ হয়েছেন। পিতৃতন্ত্রে নারীর গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিও সমস্যাপূর্ণ হয়। নারী লিঙ্গ নিরপেক্ষ হতে ভীত হন এ কারণে যে, এতে তাদের বিশেষ সুযোগ লাভ ক্ষুন্ন হতে পারে। তবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে পুরুষরা ব্যক্তিকভাবে সংসদে লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তবে তা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। এ পরিস্থিতিতে নারীর দাবি-দাওয়া সার্বজনীন দাবির রূপ নেয় না। তাই ক্ষমতায়নের নামে নারীরা 'কনসেশন', 'সংরক্ষন' বা 'কোটা পদ্ধতি' দাবি করতে থাকেন। এভাবেই নারীর বিমূর্ত নাগরিক হয়ে ওঠার পথ রুদ্ধ হয় ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর স্বাধীনতা খর্ব হয়।

(৩) গণতন্ত্র এবং হেজিমোনি

গণতন্ত্র এবং নারীবাদ নারী-পুরুষকে বিমূর্ত ব্যক্তিতে পরিণত করে পৃথকীকরণ সমস্যার সমাধানসহ সমতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারে। তবে গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের নামে বিশেষ করে অনেক দেশেই যা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা হলো পুঁজিবাদী বা

Dhaka University Institutional Repository

ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ফলশ্রুতিতে হেজিমোনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (গ্রামসি, ১৯৭১)[১৫]। শাসক শ্রেণীর কর্তৃত্ববাদী আদর্শ ও মূল্যবোধ বস্তুগত স্বার্থের সমর্থনসহ বৈধতা লাভ করে। বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পুরুষ প্রাধান্য স্বীকৃত এবং এ ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণী লাভবান হচ্ছে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলো নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত যা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি হুমকিস্বরূপ নয়। বাংলাদেশে প্রাধান্য বিস্তারকারী পুরুষ শাসকগোষ্ঠী নিজস্ব স্বার্থ রক্ষায় কনসেশন, সংরক্ষণ, কোটা পদ্ধতি ইত্যাদি ছাড় দিয়ে নারীদের সম্মতি অর্জন করে। গ্রামসি বুর্জোয়া পার্লামেন্ট ও সার্বজনীন ভোটাধিকারকে 'আদর্শগত ধাপ্পাবাজি' বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্র ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা 'অলীক কল্পনা' মাত্র (হোসাইন ও খান, ১৯৯৭)[১৬]। গণতন্ত্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হ্রাস করার রাজনৈতিক কৌশল বিদ্যমান, কারণ এতে শাসকের পরিবর্তন হয় এবং নিয়মিত সময় অন্তর ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে আপাতদৃষ্টিতে অনেক দাবি পূরণ হয়ে যায়। এভাবে গণতন্ত্রে সামাজিক সংগঠনের অবয়বে 'ফাঁদ' সৃষ্টি হয় যা হেজিমোনিক পরিমণ্ডলে সংঘাতে লিপ্ত গোষ্ঠীগুলোকে নিবৃত রাখে (গ্রামসি, ১৯৭১: ২৪৩)[১৭]। এ পরিস্থিতিতে শক্তিহীন নারী সমাজের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নিষ্ক্রিয়াসমূহ বলবৎ থেকে যায়।সেই সাথে অনুন্নত শ্রেণীও আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতার পক্ষে থেকে নারী শোষণ অব্যাহত রাখে ও পিতৃতন্ত্রকে প্রোথিত করে। পুরুষ ও পুঁজি যখন প্রভূত্ব করে তখন রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে লিঙ্গীয় সার্বজনীনতাকে দাঁড় করানোর সুযোগ সীমিত হয়ে যায়।

(৪) গণতন্ত্র, সিভিল সমাজ এবং নারী আন্দোলন:

কিছু সংখ্যক তাত্ত্বিক 'মধ্যস্থ ভূমিকাধারী' হিসেবে সিভিল সমাজের সম্ভাবনার কথা বলেন। এমনকি হেজিমোনিক পরিবেশেও বিভিন্ন ইস্যুতে দাবি উত্থাপনে কিছু কিছু সংগঠন তৎপর হতে পারে। এভাবে সমালোচনা বা দরকষাকষির প্রশ্রয় দেয়া হলেও প্রতিষ্ঠিত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগ দেয়া হয় না। সুতরাং সিভিল সমাজের বিকাশ নারী সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতবাহী সম্পর্কিত ধারণা (চৌধুরী, ১৯৯৪)[১৮] সমর্থনযোগ্য নয়। তাই নারী প্রশ্নের সমাধান প্রচলিত আদর্শ পরিবর্তনের উপরই নির্ভরশীল। নারীর মানবিক সম্ভাবনা ও ব্যক্তি হিসেবে নিজস্ব যোগ্যতার সামাজিক স্বীকৃতির জন্য আন্দোলনের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সিভিল সমাজ বিভিন্ন সংস্থার নেটওয়ার্ক গড়ার মাধ্যমে জনমত গঠন করে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিপরীতে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক (জাহাঙ্গীর, ১৯৯০)[১৯]। বাস্তবিক পক্ষে ক্ষমতা সম্পর্কের পুনরুৎপাদন প্রচলিত কাঠামোয় সামাজিক দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতির ওপর নির্ভরশীল (পর্জেওরস্কি, ১৯৮০)। নারী এজেন্ডার জন্য আবশ্যক পুনরুৎপাদন নয় বরং সামাজিক ও জেন্ডার বা লিঙ্গীয়

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন। নতুবা দাতা গোষ্ঠী, এনজিও বা সামাজিক সংগঠনের সমর্থন সত্ত্বেও নারী ইস্যুগুলো ভ্রান্তিসংকুল এজেন্ডা হিসেবেই থেকে যাবে (জাহান, ১৯৯৫)[২০]। অনেক নারী বিষয়ক গবেষক মন্তব্য করেছেন যে শুধুমাত্র প্রচলিত কাঠামোর ভেতরে নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে ঈপ্সিত পরিবর্তন আনয়ন সম্ভবপর নয় (জাহান ও পাপানেক, ১৯৯১; জাহান, ১৯৯৫; গুহঠাকুরতা, ১৯৯৭)[২১]।

২.৬ নারীর সাংবিধানিক অধিকার:

বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে রজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলেও রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। সংবিধানের ১০,২৭, ২৮(১), (২) (৩) (৪) এবং ২৯(১) নং ধারায় নারীকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদানসহ নারী-পুরুষ সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের কোথাও নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ধরণের পার্থক্য টানা হয়নি। উল্লেখিত ধারাসমূহে যা বলা হয়েছে-

ধারা ১০, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ধারা ২৭, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

ধারা ২৮(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।

(২) প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধারা ২৯(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

জনপ্রতিনিধত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও সংবিধান নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করেনি। এ বিষয়ে সংবিধানের ৬৬(১) (২) এবং ১২২ ধারায় বলা হয়েছে-

ধারা ৬৬(১)কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(চ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

ধারা ১২২(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;

(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।

সাংবিধানিক এই স্বীকৃতির পরও দেশের নারী সমাজকে এগিয়ে নিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বে নারীদের ক্ষমতায়নে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল সংগঠন নারীবাদী লেখক ও কর্মীগণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। নারীবাদী লেখক, নারী সংগঠনসমূহ লিঙ্গীয় সম্পর্কের পরিবর্তন অর্থাৎ লৈঙ্গিক বৈষম্য বিলোপ সাধনকে নারীর ক্ষমতায়নের উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। তৃণমূল সংগঠনসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে। Marty Chen ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাবি আদায় এবং উচ্চ মজুরি বা ইতিবাচক শর্তযুক্ত কাজের জন্য দাবি জানানোর সামর্থ্যকে 'রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য গবেষক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দেখেছেন সচেতনতা ও আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে। সচেতনতা নারীদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে; অপরদিকে আন্দোলনই নারীদের ক্ষমতা চর্চার নির্দেশক।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের সামর্থ ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি। কিন্তু চলমান লিঙ্গীয় বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব কিনা তাই এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টির সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি এমন এক ধরণের ধারণা যাকে বিষয়গতদিক থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায় |(Moleneu ও Moser ১৯৮৫,১৯৮৮)৪ মনে করেন যে নারীর ক্ষমতায়নে ব্যবহারিক ও পদ্ধতিগত জেন্ডার স্বার্থের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা বেরিয়ে আসে।

নারীর রাজনৈতিক বিষয়ক বর্তমান গবেষণায় আমরা প্রথমে ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক দিকসমূহ তুলে ধরবো। এই অধ্যায়ে WID, WAD ও GAD এর নারী উন্নয়ন বিষয়ক নীতিগুলো আলোচনা করবো।

যদিও Parlo Freire তার Pedagogy of the oppressed গ্রন্থে ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতার বিষয়টি আলোচনা করেন, ঐতিহাসিকভাবে Mary Wollstonecraft কেই ১৭৭২ সালে প্রকাশিত A vindication of the rights of women গ্রন্থ এবং দীর্ঘজীবনের কর্মকান্ডের জন্য নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। । সভ্যতার ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পিতৃতন্ত্রই পুরুষের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের এক অধ্যায়ের সূচনা করে। এ ইতিহাস নারীর জন্য এক অধস্তন মর্যাদা দান করে এবং পশ্চাদপদ অবস্থায় তাকে পর্যবসিত করে। ঐতিহ্যগত সমাজ থেকে আধুনিক সমাজ রুপান্তরের সময়েও এ অবস্থা টিকে রয়েছে। গত আড়াই দশকে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে এবং আন্ত র্জাতিক সম্মেলনগুলোকে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে, উদাহরণস্বরুপ ধরীত্রি সম্মেলন (১৯৯২), মানবাধিকার সম্মেলন (১৯৯৩), জনসংখ্যা সম্মেলন (১৯৯৪), বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫, ৯৯, ২০০২) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এর গুরুত্ব যে কেবল নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য তা নয় বরং নারীর সার্বিক উন্নয়নে এর অবদান অনস্বীকার্য।যখন উন্নয়নশীল দেশের নারীরা গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থায় তাদের আত্ম পরিচিতি তুলে ধরার মাধ্যমে শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়, তখন উন্নয়নে নারী নামক এক নূতন চিন্তা ধারার সূত্রপাত ঘটে।

২.৮ উন্নয়নে নারী

৭০ এর দশকে আধুনিকায়ন তত্ত্বের সমালোচনার ধারায় উন্নয়নে নারী (Women In Development -WID) নীতিমালার উদ্ভব। এই আধুনিকায়ন তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সুফল আপনাআপনি চুঁইয়ে পড়ে নারীদের কাছে পৌছবে। ঐ সময় প্রখ্যাত নারীবাদী অর্থনীতিবিদ ইস্টার বোসেরাপ'র (Ester Boserup) সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি প্রথমবারের মতো জেন্ডার সচেতন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষি অর্থনীতিতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাগের (sexual division of labour) বিষয়টি তুলে ধরেন এবং সমাজের আধুনিকায়নের সঙ্গে প্রচলিত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করেন। তিনি পুরুষ ও নারীর কাজের উপর এ সকল পরিবর্তনের চিহ্নিত ফলাফলগুলি পরীক্ষা করে তথ্যসহ প্রমাণ করেন যে, ৬০-৭০ দশকের উন্নয়নের সুফল পুরুষের তুলনায় নারীর কাছে পৌছেচে অনেক কম। কেননা দেখা গেছে আধুনিকায়নের সুফল সমভাবে বন্টিত হয়ে আদৌ নারীর কাছে পৌছেনি। পুরুষ এবং নারী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উন্নয়নের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এমনকি নারীদের অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে আরো নিম্নগামী হচ্ছে। নারীরা কেবল তাদের পুনঃউৎপাদন বা প্রজননমূলক ভূমিকায় আবদ্ধ এই প্রচলিত ধারণার বদলে নারীদের উৎপাদনশীলতার উপর তিনি দৃষ্টিপাত করেন এবং কৃষিতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উপর জোর দেন।

অতীত উন্নয়ন তত্ত্বের এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে "উন্নয়নে নারী" নামক নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণীত হয়, যেখানে ধরে নেয়া হয় যে নারীরা সম্পদ, দক্ষতা ও সুযোগের অভাবের দরুন

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত নয় এবং তাই তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে। ধারণা করা হয় যে নারীরা উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশীদার হলে বিদ্যমান অসম বা বৈষম্যমূলক জেন্ডার সম্পর্ক আপনাআপনি পরিবর্তিত হবে। উন্নয়নে নারী নীতিমালা তাই প্রয়োজনীয় আইনগত এবং প্রশাসনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পর্কিত করার উপর জোর দেয়। নারীর উৎপাদন (Productive) ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং উৎপাদনশীল খাতে নারীর পশ্চাৎপদতা কাটানোর লক্ষ্যে কৌশল উদ্ভাবনের কথা বলে। উন্নয়নে নারী মূলতঃ নারী কল্যাণমূখী দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে নারীদের গৃহকর্মে অবস্থার উন্নয়ন এবং সন্তান উৎপাদনী ভূমিকা সম্পর্কিত চাহিদা পূরণের কথা বলে।

২.৯ উন্নয়নে নারী' নীতিমালার কর্মকৌশল

- উন্নয়ন উদ্যোগগুলিতে নারীরা কিভাবে আরো ভালভাবে সম্পর্কিত হতে পারে সে দিকে আলোকপাত করা;
- নারীদের আয় উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করা;
- শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কাজ করা;
- প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ সৃষ্টি করা;
- নারীর কাজের বোঝা লাঘবের জন্য লাগসই প্রযুক্তি প্রবর্তন;
- নারীর জন্য ঋণ প্রদান ও ঋণ সেবা প্রসারিত করা;
- নারী স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশু পরিচর্যা ইত্যাদি কল্যাণমূখী দিকের উন্নয়ন সাধন।

২.১০ উন্নয়নে নারী নীতিমালার বিভিন্ন ধরণ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সামষ্ঠিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালা পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে নারী উন্নয়ন নীতিমালার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের নারী উন্নয়ন নীতিমালার উদ্ভব হয়েছে, যা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসৃত হয়ে চলেছে। এগুলি হলো: কল্যাণমূলক (Welfare approach), সমদর্শী (Equity approach), দারিদ্র্য বিমোচন (Anti-poverty approach), দক্ষতা (Efficacy approach), ক্ষমতায়ন (Empowerment approach)। এই সবগুলি এ্যাপ্রোচই উন্নয়নে নারী উন্নয়ন নীতমালার অর্ন্তভূক্ত। নারীর ক্ষমতায়ন WID-এর ডিসকোর্সের ৫টি এ্যাপ্রোচের মধ্যে অন্যতম। Caroline Moser (নলিনি ১৯৯৭:২০) এর মতে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এসব এপ্রোচ অনুসরণ করা হয়েছে। ১৯৫০-৬০ এর দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, Welfare approach নারীর পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকার উপর জোর দিয়েছে এবং জনসংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা করেছে। equity approach জাতিসংঘের নারী দশকের বিকাশ লাভ করে। এর লক্ষ্য ছিল উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং সম-অধিকার অর্জন করা।

২.১১ উন্নয়নে নারী' নীতিমালার সীমাবদ্ধতা

- উন্নয়নে নারী নীতিমালা এমন প্রচলিত ধারণা পোষণ করে যে নারীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়;
- প্রচলিত বৈষম্যমূলক সামাজিক কাঠামোকে মেনে নেয়। কখনই নারীর প্রচলিত অধঃস্তনতার উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে না;
- সংঘাতহীন, আপোষকামী মনোভাব পোষণ করে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে নারীরা পুরুষের সমান উপকৃত না হওয়ার কারণ উদ্ঘাটনে উদ্যোগী হয় না;
- নারীর দারিদ্র্য ও অধঃস্তন অবস্থার মূল কারণ স্বরূপ পিতৃতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে না;
- শ্রেনী, বর্ণ, ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে নারীদের একটি আলাদা বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ হিসাবে দেখা হয় এবং বিচ্ছিন্নভাবে নারীর চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়;
- নারীর জীবনে উৎপাদনশীল (Productive) দিকের উপর বেশি জোর দেয়া হয় কিন্তু নারীর প্রজনন বা পুনঃউৎপাদনমূলক (Re-Productive) ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা হয়;
- নারীর গার্হস্থ্য কাজ ও দায়-দায়িত্বের বোঝা লাঘব না করেই তাকে শ্রমের বাজারে ঠেলে দেয়া হয়;
- সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং নারীর অনভিজ্ঞতার প্রশ্ন তুলে নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিধিকে প্রায়শঃই সীমিত করা হয়;
- ধরে নেয়া হয় যে, নারীরা উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশীদার হলে নারীর বিদ্যমান অধঃস্তন অবস্থা আপনাআপনি পরিবর্তিত হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'উন্নয়নে নারী নীতিমালাই' প্রথম নারী উন্নয়ন নীতি, যা উন্নয়ন তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারী ইস্যুটিকে মূর্তভাবে সামনে নিয়ে আসে।

৭০-এর মাঝামাঝি সময়ে WID এপ্রোচের সমালোচনার ফল হিসেবে নারী ও উন্নয়ন (WAD) এপ্রোচের উদ্ভব ঘটে। WAD এপ্রোচ নির্ভরশীলতার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই নির্দেশ করে যে, একটি বিভেদমূলক আন্তর্জাতিক কাঠামোর অস্তিত্ব রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি প্রথম বিশ্বের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে, এই নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে এই এপ্রোচে উৎপাদন প্রক্রিয়ার তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র লোকদের অর্ন্তভূক্তির উপর জোড় দেয়। WAD এপ্রোচ করে যে নারীরা সর্বদাই উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ ছিল, তাই তাদেরকে নূতন করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অর্ন্তভূক্ত করার প্রয়োজন নেই। তারা বরং শোষণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত যা তাদেরকে বিভেদমূলক আন্তর্জাতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রন করতে সহযোগিতা করবে। পুরুষরাও এই প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। WAD এপ্রোচে বলা হয়েছে যে, নারীদের সমস্যা আলাদাভাবে দেখা উচিত নয়। এটি নারীদের অর্থনেতিক কর্মকান্ডের উপর জোর দেয় এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় নারীর সীমিত প্রতিনিধিত্বের সমর্থন হিসেবে পরিকল্পিত অন্তর্ভূক্তি পদ্ধতি সম্পর্কে কথা বলে। এটা ধরে নেয়া হয় যে, যদি আন্তর্জাতিক কাঠামো অধিক ইকুইটিবল হয়, নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কিন্তুWAD এপ্রোচে কঠিনতা রয়েছে। এটি কখনোই জেন্ডারের ভূমিকা নিয়ে কথা বলে না এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে নারীর কর্মকান্ড সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি নারীদেরকে সমজাতীয় গোষ্ঠীর হিসেবে বিবেচনা করে।

২.১২ জেন্ডার এবং উন্নয়ন

১৯৮০-এর দশকে উন্নয়নে নারী, নারী এবং উন্নয়ন নীতিমালার সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে জেন্ডার এবং উন্নয়ন (Gender And Development সংক্ষেপে গ্যাড GAD) নামক নারী উন্নয়ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ এই তত্ত্বের ভিত্তি।

জেন্ডার এবং উন্নয়ন হচ্ছে একমাত্র নারী উন্নয়ন নীতিমালা যা নারীর জীবনের সকল দিককে ধারণ করে নারী কর্তৃক সম্পাদিত উৎপাদনমূলক বা পুনঃউৎপাদনমূলক, ব্যক্তিগত বা সামাজিক সকল ধরণের কাজের ওপর মনোযোগ স্থাপন করে, পারিবারিক ও সাংসারিক কাজকে অবজ্ঞা করার যে কোনো প্রচেষ্টাকে নাকোচ করে। এই নীতিমালা কেবল নারীর ওপরই নয়, জীবনের সবক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের ওপরই আলোকপাত করে। জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালা তাই 'নারী' শব্দটির পরিবর্তে 'জেন্ডার বা জেন্ডার সম্পর্ক' শব্দটি ব্যবহার করে।

মূলতঃ নারী-পুরুষের মধ্যকার নানা সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই এই জেন্ডার এবং উন্নয়ন বা গ্যাড নীতিমালার উদ্ভব ঘটেছে। নারী-পুরুষের মধ্যেকার এই সম্পর্ক হতে পারে আরোপিত–যেমন জন্মগত ও বৈবাহিক সূত্রে, জ্ঞাতি-গোষ্ঠিগতভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক। আর কতগুলো সম্পর্ক হলো আবার অর্জিত সম্পর্ক। যেমন- একজন নারী তার দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত হওয়ার ভিত্তিতে যে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই আরোপিত সম্পর্ক (জন্ম ও

Dhaka University Institutional Repository

বৈবাহিক সূত্রে) এবং অর্জিত সম্পর্ক (রাজনীতিবিদ,আইনবিদ, চাকুরীজীবী) আবার শ্রেনী, বর্ণ, জাতি, ধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে বিজড়িত।

গ্যাড নীতিমালা নারীকে উন্নয়নের পরোক্ষ উপকারভোগী নয় বরং সক্রিয় চালিকাশক্তি রূপে বিবেচনা করে। যদিও এখানে কখনো ধরে নেয়া হয় না যে, নারীরা তাদের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত। কেননা, দেখা যায় একজন নারী ব্যক্তিগতভাবে তার হীন অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হলেও এই বৈষম্য ও অধঃস্তনতার মূল ভিত্তিকে সনাক্ত করতে সক্ষম নাও হতে পারে। ঠিক তেমনি এই নীতিমালায় কখনই মনে করা হয় না যে, পুরুষ মাত্রই পুরুষ প্রাধান্যের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে সচেতন বা সকল পুরুষ মানুষই প্রাধান্য বজায় রাখার সক্রিয় উদ্যোক্তা।

গ্যাড এ্যাপ্রোচ সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে। সমাজেব একটি ইস্যুকে তুলে ধরার সময় তা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রাখে। উন্নয়নকে এখানে দেখা হয় একটি জটিল প্রক্রিয়া রূপে যা ব্যক্তি বিশেষের এবং সমাজের নিজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনের সঙ্গে জড়িত। উন্নয়ন সাধনের অর্থ এখানে একটি ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণযোগ্য মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর শারীরিক, মানসিক, সৃজনশীল চাহিদা পূরণে সমাজ ও তার সদস্যদের সামর্থ্য। একটি সমাজের বা সমাজের একটি গোষ্ঠির ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের (হতে পারে পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত) প্রভাব পরীক্ষা করার সময় জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালা প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এই উন্নয়ন থেকে কে লাভবান হচ্ছে, কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, নারী ও পুরুষের মধ্যে উন্নয়নের সুফল কিভাবে বন্টিত হচ্ছে, কিভাবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হচ্ছে।

এছাড়াও গ্যাড নারীর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করে। কেননা, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অধিকাংশ উন্নয়নশীল বিশ্বে রাষ্ট্রের দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে। একদিকে তা শ্রমশক্তিতে সবচেয়ে বড় নিয়োগকারী এবং অন্যদিকে সামাজিক মূলধন বরাদ্দকারী। সেই জন্য গ্যাড নীতিমালা ভবিষ্যত প্রজন্মের লালন-পালনের জন্য সামাজিক মূলধন যোগানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তব্যের ওপর জোর দেয়। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সামাজিক ব্যয়ের ভূমিকায় ওপর গুরুত্বারোপ করে। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে বলা হয় যে আগামী প্রজন্মের মানব উন্নয়নের বিষয়টি কেবল ব্যক্তিবিশেষের একার দায়িত্ব নয়। এটি একটি সামাজিক বিষয় এবং রাষ্ট্রের এক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু করণীয় রয়েছে। আর মানব উন্নয়নে স্থানীয়, আঞ্চলিক, কেন্দ্রীয় সকল পর্যায়েই রাষ্ট্রকেই মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে কেননা নারীরা এখনো রাজনৈতিক শক্তির দিক থেকে খুব দুর্বল এবং জাতীয়, আঞ্চলিক এমনকি স্থানীয় পর্যায়ে তাদের দর কষাকষি করার ক্ষমতা সীমিত।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন কর্মকৌশল অবশ্যই যেন নারীর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে ছাড়িয়ে নারীর রাজনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা পর্যন্ত প্রসারিত হয়, সে দিকে মনোযোগ দাবি করে গ্যাড।

নারী উন্নয়নে সাহায্য-সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা পালনের ওপর এই নীতিমালা মনোযোগ স্থাপন করে এবং স্থানীয় পর্যায়ের নারী সংগঠনকে ভবিষ্যতে উচ্চ পর্যায়ে নারী সংগঠনে রূপলাভের পূর্ব লক্ষণ স্বরূপ চিহ্নিত করে। যেহেতু নারীরা স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়শঃই পারিবারিক স্তরেই প্রথম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, সে জন্য গ্যাড নীতি নারী মুক্তির প্রশ্নে পরিবার ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কাছ থেকেই প্রথম সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালায়।

গ্যাড বা জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতি মনে করে যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। তাই নারীর অগ্রগতির পথে পদক্ষেপ হলো এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে করে নারী ও পুরুষ দারিদ্র্য থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। দেখা যায় যে দরিদ্র্যতা সৃষ্টিকারী অবস্থাকে মোকাবিলা করার সামর্থ্য দরিদ্র্যের নেই। সে জন্য এই নীতিমালা দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কল্যাণমূলক বা মৌলিক চাহিদা পুরণ কর্মসূচির মধ্যেও জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির উপাদান সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেয়। কল্যাণমূলক ও দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাপ্রোচকে সমতা অর্জনের উপায়ে রুপান্তরিত করতে চায়। এই সচেতনতা অর্জনের বিষয়টি কেবল অধিকাংশের জন্য দরিদ্র্যতা ও মুষ্টিমেয়দের জন্য প্রাচুর্য্য সৃষ্টির বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও মূলধনের অসম বন্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্টনে ভারসাম্যহীনতাকেই নয়, সেই সঙ্গে নারী-পুরুষের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্যমূলক কাঠামোকেও ধারণ করে, যা কিনা চূড়ান্ত অর্থে নারী-পুরুষ উভয়কেই নিজ নিজ অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য তাদের সাধারণ লড়াইকে দুর্বল করে দেয়। সে জন্য সংগঠিত হওয়া, সংহতি ও সমঝোতা গড়ে তোলা, জনসংযোগ, জনশিক্ষা ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করে গ্যাড। জেন্ডার এবং উন্নয়নই প্রথম নারী উনয়ন নীতিমালা যা দারিদ্র্যের নারীমুখীনতাকে উপলব্ধি করে এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করে নির্দিষ্ট টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনের কথা ঘোষণা করে। দারিদ্র্যকে মেরামত করা, গুটিকতক দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করার বদলে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও পিতৃতন্ত্র যা দরিদ্র্যতা ও নারীর হীন মর্যাদার মূল কারণ, তাকে চ্যালেঞ্জ করে। একটি অধিকতর ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাধর্মী সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, মনোভাব ও কর্মকান্ড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে জড়িত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়াটাই হলো জেন্ডার এবং উন্নয়নের মূল কথা।

Dhaka University Institutional Repository

জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য নারীর ক্ষমতায়ন। তাদের এমন স্তরে উন্নীত করা যেখান থেকে তারা নিজেদের অধিকার, পছন্দ, অগ্রাধিকারের জন্য লড়াই করতে সক্ষম। এ নীতি এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে যেখানে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেনী বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই সমতার ভিত্তিতে বিবেচিত। এ নীতি বাস্তবায়নের ফলে এমন একটি সমাজ হবে যেখানে নারী ও পুরুষ সাম্যতার ভিত্তিতে কাজ করবে। এ নীতিতে একজনের কাজকে অন্যজনের কাজের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় ফলে শ্রম বিভাগ লিঙ্গীয় ভিত্তিতে নয়, সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।

২.১৩ জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালার বৈশিষ্ট্য

- নিছক নারী উন্নয়ন নয়, নারী-পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়নে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে;
- পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে;
- নারীকে সমস্যা নয়, সমাধানের কারণ রূপে দেখে;
- সমস্যার উপসর্গ বা লক্ষণ নয়, কারণগুলোকে চিহ্নিত করে;
- নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসম বা বৈষম্যমূলক সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের দাবি জানায়;
- নারীর অধঃস্তন অবস্থাকে বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ দেখে;
- নারীর অধঃস্তনতার ভিত্তি স্বরূপ বিরাজমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে তার অবসান চায়;
- নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসম বা বৈষম্যমূলক সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের দাবি জানায়;
- নারীর অধঃস্তন অবস্থাকে বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ দেখে;
- নারীর অধঃস্তনতার ভিত্তি স্বরূপ বিরাজমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে তার অবসান চায়;
- নারী-পুরুষের মধ্যে প্রচলিত কাজের বরাদ্দ, দায়-দায়িত্ব অর্থাৎ সমাজ কর্তৃক আরোপিত জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজনের বিলুপ্তি দাবি করে;
- পরিবার ও পরিবারের বাইরে নারীর সকল পারিশ্রমিক বিহীন কাজ ও অবদানের যথাযথ মূল্য ও স্বীকৃতি প্রদান করে;
- মূলতঃ নারীকে সম্বোধন করলেও নারীর বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে পুরুষকেও সম্পর্কিত করে;
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সহায়ক সকল ধরণের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়;
- অনেকাংশে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা দৃঢ় অঙ্গীকার দাবি করে।

জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালা নারীর তিন ধরণের ভূমিকাকেই (পুনঃউৎপাদনমূলক, উৎপাদনমূলক এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক) স্বীকৃতি দেয় এবং এদের মধ্যে ভারসাম্যের কথা বলে। এমনকি নারীর একটি ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রেও নারীর বাদ-বাকি ভূমিকার কথা বিবেচনা করে পরিকল্পিত হস্তক্ষেপ করা হয়। নারীর বাস্তবমুখী ও কৌশলগত উভয় ধরণের জেন্ডার চাহিদা পূরণ করে জেন্ডার এবং উন্নয়ন বা গ্যাড নীতি।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৪ নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার উন্নয়নের মূল পার্থক্য

উন্নয়ন এর মূলস্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণবৃদ্ধির জন্য ৫০ দশক থেকে প্রচেষ্টা শুরু হয়। নারী উন্নয়ন এর বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়: যেমন কল্যান মূলক, সমদর্শী, দারিদ্র বিমোচন, দক্ষতা, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি । নারী উন্নয়ন এবং জেন্ডার ও উন্নয়ন উভয়ের লক্ষ্য হলো নারীর মর্যাদা, অংশগ্রহণ ও সুবিধাসমূহ বৃদ্ধি করা । তবে যে যে ক্ষেত্রে পার্থক্য তা হলো-

উন্নয়নে নারী	জেন্ডার এবং উন্নয়ন
❑ নারীর জৈবিক কারণই তার অধঃস্তনতার উৎস। নারীর সমস্যার মূল কারণই হলো নারী নিজে।	❑ নারীর অধঃস্তনতার উৎস হলো সমাজে নারী ও পুরুষের সাথে অসম সম্পর্ক ।
❑ নারীর দুর্বলতা/প্রয়োজন প্রশ্ন করে কি এবং কি দিতে হবে	❑ নারীর দুর্বলতা /প্রয়োজন প্রশ্ন করে কেন এবং কি পরিবর্তন করা দরকার
❑ রোগের লক্ষণকে চিকিৎসা করে । অর্থাৎ নারী সমস্যার উপসর্গ বা উপলক্ষ্যকে সমাধানের প্রয়াস পায়	❑ রোগের কারণের চিকিৎসা করে অর্থাৎ নারীর সমস্যার সামাজিক কারণ সমাধানের চেষ্টা করে
❑ স্বল্প মেয়াদী	❑ দীর্ঘ মেয়াদী
❑ অভিষ্ট জনগোষ্ঠী হিসেবে কেবল নারীকেই বিবেচনা করা হয়। কখনই পুরুষকে বিবেচনায় রাখে না	❑ পুরুষকে অভিষ্ট জনগোষ্ঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয় যদি তা নারীর স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৫ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ ও নারী উন্নয়ন

রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্মদাত্রী ও লালনপালনকারী হিসেবে নারীর ভূমিকাকে নাগরিকের কাজ হিসেবে যুক্তি প্রদর্শন করে নারীকে পূর্ণ নাগরিকতার অধিকার প্রদানের জন্য দাবি জানান নারীর পক্ষশক্তি। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ নারীর মর্যাদা, কাজ ও ভূমিকা 'প্রাইভেট' বা পারিবারিক ক্ষেত্রে সঙ্গে যুক্ত বলে 'পাবলিক' ক্ষেত্র বা বাইরের জগতে সরাসরি অংশগ্রহণ ও পূর্ণ নাগরিকতা প্রাপ্তির জন্য নারীকে অনুপযুক্ত বলে মনে করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাবের পর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সরকার বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এভাবে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক- নারীর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কতিপয় ব্যবস্থা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের মোট নারীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং এদের মধ্যে রয়েছে বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যাক্তা। ফলে সম্পদ, শিক্ষা, প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত এই সকল নারী মানবেতর জীবন-যাপন করে। বাঁচার তাগিদে অদক্ষ এই সকল মহিলা সামান্য বেতনে বেসরকারি খাতে নিয়োজিত। বাংলাদেশের সকল পরিকল্পনায় নারীকে পুরুষের তুলনায় "Weaker-Sex" বা "vulnerable group" হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে নারী উন্নয়নে সরকারি কোনো নির্দিষ্ট পন্থা নেই এবং সরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও উদাসীনতা দেখা দেয়। জেন্ডার-রিলেটেড ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (GDI) অনুযায়ী ১৩৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১১৬ তম। এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় রাষ্ট্রের শাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা

১. জাহাঙ্গীর ,বোরহানউদ্দীন খান " গ্রামীণ রাজনীতি ও নারী সমাজ" সমাজ নিরীক্ষণ সংখ্যা-২০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা,১৯৮৬ ।

২. হোসাইন ,নাসিমা আখতার "নারীদের অধস্তনতা ও বাংলাদেশের সমাজ " সমাজ নিরীক্ষণ সংখ্যা-২২,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা,১৯৮৭ ।

৩. Hussain Naseema and Khan S "Culture and politics in Bangladesh: Some reflections" paper presented in Social Science, Faculty Seminar ju 1996.

৪. Moser C, Gender Planning and Development theory Practice and Training, London: Routledge.

৫. প্রাগুক্ত

৬. Rowlands, J, Questioning Empowerment working with Women in hondarances: UK Oxfam, 1977.

৭. Price, J. Women's Development: Welfare Project or Political empowerment, Amsterdam conference Mimeo.

৮. Friedmann, J. Empowerment: The politics of alternative Development, Blackwell Publishers, London.

৯. Kate young,1993,P.157

১০. Opcit,1993

১১. Kate Millet, Sexual politics, Garden city, Double Day, Newyork 1970.

১২. Moniq Wittig, "One is not born a woman" in the second sex thirty years later: A commemoration conference of feminist Theory, mimeographed, Institute for the Humanities, New York 1979.

Marge Piercy, Women on the edge of time, Faweett, New York, 1978

Dhaka University Institutional Repository

১৩. Sylvia, Federici, Wages Against Housework,Falling Wall Press,Bristol 1973, Wally Secombe "The Housewife and Her labor Under capitalism" New Left Review, No, 83, 1974.

১৪. Paterman C, "Feminism and Democracy in Pateman C, Disorder of women, Polity Press, Cambridge, 1990.

১৫. Gramsci, A. Prison notebooks, International Publishers, NY, 1971.

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. চৌধুরী,নাজমা ও বেগম হামিদা আক্তার,(সমন্বয়কারী) নারী ও উন্নয়ন:প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান,উইমেন ফর উইমেন,১৯৯৫,পৃ ১২৮-১২৯

১৯. Jahangir B.K. Violence and consent in a Peasant Society and other essays, DU 1990.

২০. Jahan Rounaq, The Elusive Agenda Mainstreaming Women in Development UPL Dhaka 1995.

২১. Jahan Rounaq and Papenak H (eds), Women and Development Perspectives from South and South-east Asia BILLA, Dhaka 1979.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

৩.১ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নারী

একটি দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। অতএব রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সকল নাগরিকের সমতা অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদানে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নেরও পূর্বশর্ত যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ইস্যুসমূহ অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোকে সুনির্দিষ্ট মাত্রার ঐক্যমত্যের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি সম্পন্ন হতে পারে। এভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দৈনন্দিন গণতান্ত্রিক অধিকারের মাত্রা সূচিত হয়। এখানে নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার জড়িত এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্দেশ করে। এটি এমন কতক কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে নাগরিকরা সরকারী নীতিমালাকে প্রভাবিত করতে পারে। কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রত্যয়টিকে সরাসরি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করেছে। অন্যরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে আরো সুনির্দিষ্ট করেছেন। ভোট দেওয়া, রাজনৈতিক দলের জন্য প্রচার করা রাজনীতি সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখা, গণসমাবেশে ও আলোচনায় যোগ দেওয়া ইত্যাদি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হতে পারে আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে এবং নারীর ক্ষেত্রে দৈনন্দিন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ।গণতন্ত্রের মাত্রা ও সকল নাগরিকের অধিকার অর্জন নির্ভর করে তাদের অংশগ্রহণের লেভেলের উপর। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য পদ/অবস্থানের বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৪৫টি দেশের আইনসভার ৩১,১৫৪টি আসনের মধ্যে ১৫ শতাংশ আসন অধিকার করে আছে নারী। ৭৩টি দেশে নারীর প্রতিনিধিত্ব ১৯৭৭ সালে ১২.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৮ সালে ১৪.৫ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৭ সালের রিপোর্টে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ২৭টি দেশের আইনসভাতে নারী সদস্যপদ ৭ শতাংশ । সার্কভূক্ত দেশগুলিতে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় যে, ভূটানে ১.৩ শতাংশ (১৯৭৫), ভারতে ৯.৯ শতাংশ (১৯৮৪), শ্রীলংকাতে ৪.৭ শতাংশ (১৯৮৩), মালদ্বীপে ৪ শতাংশ, নেপালে ৫.৭ শতাংশ (১৯৮৬), পাকিস্তানে ৮.৮ শতাংশ (১৯৮৫), ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২০টি নারীর জন্য সংরক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। বাংলাদেশ ১০ শতাংশ (১৯৯১) যেখানে ৩৩০টি আসনের মধ্যে ৩০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে জাতীয় সংসদে।(জরিনা রহমান ১৯৯৮)[১]

১৯৯১ সালের মধ্যে ১৮জন নারী রাষ্ট্রীয় প্রধান হয়েছেন যার মধ্যে ৪ জন দক্ষিন এশিয়াতে। ১৯৯০ সালে মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের ৩.৫ শতাংশ ছিল নারী এবং প্রায় ৯৩টি দেশের মধ্যে মন্ত্রিসভায় কোন নারী সদস্য ছিল না।

সত্তর দশকের প্রথম দিকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অধিকাংশ দেশে নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ জাতীয় সরকারের সহযোগিতা নিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশের নারী ইস্যুর উপর আলোকপাত করার জন্য বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করে।

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের আগ পর্যন্ত নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী ইস্যু নীতি পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করাসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। গণজীবন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি ১৯৮৫ সালে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত হয় । এ সম্মেলনে যে স্ট্রেটেজিগুলো গ্রহণ করা হয়,তা সরকার, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্যদেরকে অবহিত করা হয়েছে এবং জাতীয় আইন সভায় নারীর অংশগ্রহণে সমতা অর্জনের বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে নাইরোবী সম্মেলনে নারীরা ক্ষমতা কাঠামোয় প্রবেশের ক্ষেত্রে যে সকল বৈষম্যের শিকার হয় তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা কাঠামোই সমাজকে নিয়ন্ত্রন করে এবং উন্নয়ন বিষয়সমূহ নির্ধারণ করে। এখানে প্রতিবন্ধকতা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়;যেসব প্রতিবন্ধকতা প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এসেছে। এখানে আরো বলা হয় যে, নারীর সাফল্য নির্ভর করে একে অপরকে সম্মিলিত সাহায্য করার উপর। নারীর সত্যিকার সমতা অর্জিত হবে পুরুষের সাথে সমান ক্ষমতার আদান প্রদান করার মাধ্যমে।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশ নারী উন্নয়নের নীতি ও কর্মসূচী পালন করে আসছে। সরকার বিদেশী সাহায্যের উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ায় ডোনারদের প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী নারী বিষয়ক নীতিমালা প্রনয়ন করে। অতএব এটি হয়ে যায় তাদের চাহিদার তুলনায় ডোনারবান্ধব নীতি। এ নীতিতে সরকারের প্রতিশ্রুতির অভাব থাকে ।

সরকার গৃহীত প্রথম তিনটি পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী বিষয়গুলো আলাদাভাবে আলোচনা করা হলেও প্রধানধারার উন্নয়ন কর্মসূচী পরিকল্পনার সাথে এটির কোন সম্পর্ক নাই। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনায় ম্যাক্রো অর্থনৈতিক কাঠামোতে উন্নয়নে নারী (WID) প্রত্যয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যাই হোক নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়নি।

৩.২ বৃটিশ আমলে রাজনীতিতে বাঙ্গালী নারীর অংশগ্রহণ

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো ভারতের নারীরা ব্রিটিশ শাসনের শুরুর পূর্বে যেমন পশ্চাদপদ অবস্থায় ছিল ব্রিটিশ শাসনের পরেও তাদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি ঘটেনি। নগরায়ন তখন খুব সীমিত আকারে ছিল। অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করত এবং জমি ছিল তাদের আয়ের প্রধান উৎস। ঐ সময়ে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন একটি রক্ষনশীল সামাজিক ব্যবস্থার জন্ম দেয় যেখানে নারীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নারীরা তাদের মর্যাদা, সম্মান, অধিকার ও সম্মানের বিষয়ে সচেতন ছিল না। তারা ছিল মূলত ঐতিহ্যবাহী সমাজের অনুসারী ও পর্দানশীল। সঠিক শিক্ষা, গণমাধ্যম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না থাকার কারনে এটি ঘটেছিল। সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় রীতিনীতির মাধ্যমে তাদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো। নারীরা ছিল গৃহবন্দী। তারা গৃহস্থ কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ ছিল। তারা পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরকে কৃষিকাজে সহযোগিতা করতো। কিছু কিছু নারী কুটির শিল্পে কাজ করত। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ আধুনিকায়নের নামে কার্যত নারীদের কর্মহীন ও মর্যাদাহীন করছে। দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার নারীদের কথা উল্লেখ করে ওয়েন বর্ণনা করেন কিভাবে নারীদের উৎপাদন পদ্ধতি বিলোপ করে ও সস্তা বুনন যন্ত্র স্থাপন করে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ নারীদের কর্মহীন ও মর্যাদাহীন করেন।(এন,ওয়েন,১৯৭৮)[২] বৈদ্যর মতে, আধিপত্যবাদী মতাদর্শে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন বিষয়ে, ভিন্ন অর্থ, অনুমান, সন্দেহ, প্রশ্ন ও চিন্তার বিকাশ ঘটান। এই বিকল্প ও অসংলগ্ন চিন্তা গুলি সাধারণত সুশৃংখল ও সংগঠিত হয় না।(বৈদ্য,১৯৭৭)[৩]

ভারত প্রায় ২শ বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল (১৯৫৭-১৯৪৭)। ঔপনিবেশিক সরকার শোষণের নীতি অনুসরণ করতো। ঔপনিবেশিক আমলে পুরুষের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কালক্রমে, ভারতীয় জনগণ, বিশেষ করে পুরুষ প্রজারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। যে সব নারী ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তারা ছিল নগর সমাজের উচ্চ শ্রেণীর অধিবাসী। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ছয় জন নারী যোগ দেন। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন বাঙালি। ওই দু'জনের একজন হলেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ড. কাদম্বিনী গঙ্গোপধ্যায় এবং অপরজন জানকী নাথ ঘোষালের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রথম দিকে কংগ্রেসের আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম। "Women's involvement in socio-political movements also depends upon the policies followed and support rendered by the dominant political parties of the

Dhaka University Institutional Repository

country to a great extent .Unlike the congress which actively participated in various social reforms in the later part of the 19^{th} century ,the muslim league the only muslim major political party of muslims at that time ,though allowed women to become members basically upheld the conventional role and image of women and the leadership concentrated itself in purely political issues of the minority community rather than socio-cultural reforms. (সালমা খান ১৯৯৩)[৪]। কিন্তু পরে তা বাড়তে থাকে। তখন রাজনীতিতে যারা আসেন তাদের সবারই আগমন ঘটেছিল পারিবারিক সূত্র ধরে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরপর রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়তে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৭ সালে অ্যামি বেসান্ত ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও ব্যাপক হারে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওই সময়ে নারীর ওপর নেমে আসা বৃটিশদের অত্যাচার, নির্যাতন ও জুলুম নারীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অসহযোগ আন্দোলনে নারী কর্মীদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করেন বাসন্তী দেবী। উর্মিলা দেবী ১৯২১ সালে *নারী কর্ম মন্দির* প্রতিষ্ঠা করে মেয়েদের সত্যাগ্রহের শিক্ষা দেন। এর মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে হেম প্রভা মজুমদার, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, দৌলতুন্নেসা, আসা লতা সেন, নেলী সেন গুপ্তা, মোহিনী দেবী, সরলা গুপ্ত প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং নিজ উদ্যোগে একটি করে নারী সংগঠন গঠন করে নারীকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে শুরুকরেন|"Gandhiji was in firm opinion that non-violent struggle which required no physical strength but only moral courage and determination was more suitable to women to men". (তীর্থ মন্ডল ১৯৯১)[৫]। উনিশ শতকে পরিবার ও সমাজে নারীর অধিকার প্রকৃত অর্থে স্বীকৃতি পায়নি। তাদের রাজনৈতিক ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। গোলাম মোর্শেদের ভাষায় "The changes took place inthe nineteenth century as a process of modernization rather than emamipation or liberation of women because women gained very little autonomous control over the direction of their lives" কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষার সুযোগ নারীদের অধিকার আদায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ঐ শতকে নারীর উপর বড় বড় অর্জনসমূহ সতীদাহ প্রথা বিলোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ উপমহাদেশ ও বিশ্ব রাজনীতিতে নারী

জাতিসংঘ বলেছে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের সমান নয়। বরং নারী সমাজ রাজনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে। শাসন ক্ষমতার বন্টন বিশ্বব্যাপী ভারসাম্যহীন। আর ওই ক্ষমতা বন্টনের পাল্লা অবিবার্যভাবে পুরুষসমাজের দিকে এ প্রসঙ্গে গান্ধীজির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য "Woman is the companion of men, gifted with equal mental capacities .She has the right to participate in the minutest details of the activities of man and she has the same rights of freedom and liberty as he. By sheer force of a vicious custom, even the most ignorant and worthless man have been enjoying a superiority over women which they do not deserve and ought not to have." (গান্ধীজি ১৯২২)[৬]

তারপরও আমরা এ পর্যন্ত বিশ্বে মোট ৩০ জন নারীকে শাসন ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছুতে দেখেছি। তাদের মধ্যে কেউ রাষ্ট্র প্রধান হয়েছেন, কেউ অধিষ্ঠিত হয়েছেন সরকার প্রধানের পদে। নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন সুদীর্ঘ কালের হলেও ১৯৬০ সালকে এ ক্ষেত্রে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ওই বছর শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন শ্রীমাতো বন্দরনায়েকে। বলা হয়ে থাকে বর্তমান বিশ্বে এটাই প্রথম কোন নারীর ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছার ঘটনা। এরপর একে একে ক্ষমতার শীর্ষে পৌছেন, ইসরায়েলের গোল্ডমেয়ার, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার, নরওয়ের গ্রোহারলেম ব্রান্ডটল্যান্ড, ফ্রান্সের অ্যাডিস ক্রেমন, শ্রীলঙ্কার মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী, ফিলিপাইনের গ্লোরিয়া আরোয়া ম্যাকাপাগাল এবং বাংলাদেশের বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা প্রমুখ। এরা সবাই রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে পৌছে রাজনৈতিক অঙ্গনে নালী নেতৃত্বের নতুন ধারা সূচনা করেন। রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেন। তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে পৌছা নারী নেত্রীদের ওই তালিকা থেকে সাতজনকে আমরা খুঁজে পাই এশিয়া মহাদেশে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, তাদের অধিকাংশেরই রাজনীতিতে আগমন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের ঘটনা ঘটেছে পারিবারিক সূত্রে। যেমন, শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে, চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা, মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী, বেনজীর ভুট্টো, শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া- প্রত্যেকেরই রাজনীতিতে আগমন পারিবারিক সূত্রে।

উপমহাদেশের দিকে আলাদাভাবে তাকালে দেখা যায়, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ- এই তিনটি দেশেরই শাসন ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছেন নারী। বলিষ্ঠভাবে তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। তারপরও উপমহাদেশের এই তিনটি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ আশানুরূপ হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে উপমহাদেশের দেশগুলোয় শাসন ক্ষমতার শীর্ষে নারীর অধিষ্ঠানকে ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবেই দেখেন। তারা বলেছেন, উপমহাদেশে নারীর রাজনৈতিক সাফল্য মূলত পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছোটবেলা থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকলেও বেনজীর ভুট্টো, শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া এবং শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে- সবারই রাজনীতিতে আগমন ঘটে পারিবারিক সূত্র ধরে।

এছাড়া বিশ্ব রাজনীতিতে আরেক আলোচিত নারী নেত্রী হলেন মিয়ানমারের অং সান সুচি। তার দল নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও দেশটির সামরিক জান্তা তার কাছে আজও ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। নোবেল শান্তি বিজয়ী অং সান সুচি মায়ানমারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এজন্য জোর আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

জাতিসংঘের প্রস্তাব ছিলো, দেশ পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে অন্তত ৩০ শতাংশ আসনে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু বিশ্বের কম সংখ্যক দেশেই তা বাস্তবায়ন হয়েছে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বিশ্ব রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ। পার্লামেন্টে নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী প্রতিনিধিত্ব করেন সুইডেনের পার্লামেন্টে। সেখানে নারীর প্রতিনিধিত্ব ৪২.৭ শতাংশ আসনে। নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডের পার্লামেন্ট নারীর প্রতিনিধিত্ব ৩৯ শতাংশ আসনে এবং ডেনমার্কের পার্লামেন্টে এই হার ৩৭.৪ শতাংশ। আর উন্নয়নশীল ৫৫টি দেশে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ওই দেশগুলির পার্লামেন্টে গড়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব ৫ শতাংশ বা তারও কম আসনে। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে ৩০ শতাংশ আসনে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার যে প্রস্তাব জাতিসংঘ নিয়েছে, তা প্রস্তাব আকারেই রয়ে গেছে, (গৌতম ২০০৩)[৭]। বাস্তবে কার্যকর হয়েছে মাত্র কয়েকটি দেশে। কিন্তু নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জাতিসংঘের ওই প্রস্তাব কার্যকর করা জরুরি।

জাতিসংঘের "Women in Politics and Decision-Making in the late Twentieth Century" [৮] শীর্ষক এক গবেষণা রিপোর্টে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্বের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলা হয়, "নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রথমত: গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবি অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়ত: নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান। তৃতীয়ত নারী তাদের

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল; কিন্তু যদি রাজনীতিতে তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থান ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। চতুর্থত: নারীর সবল সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা, নারীর জীবন ও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতাবহির্ভূত বলে বিবেচিত, সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচিত হবে। পঞ্চমত: দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি আবশ্যক।

৩.৪ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হওয়া শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। ওই বছর অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে পাঁচ জন মহিলা প্রার্থী বিজয়ী হন। এর আগে ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে কোন মহিলা প্রার্থী সরাসরি ভোটে জয়লাভ করতে পারেননি। তবে ১৯৭৯ সালে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে দু'জন মহিলা প্রার্থী সরাসরি নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হন। আর ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারটি আসনে এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আটটি আসনে মহিলা প্রার্থী বিজয়ী হন।

সংরক্ষিত ও সাধারণ আসন মিলে ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল ৪.৮ শতাংশ আসনে। ওই হার ১৯৭৯ সালে ছিল ৯.৭ শতাংশ, ১৯৮৬ সালে ১০.৬ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ১০.৬ শতাংশ এবং ১৯৯৬ সালে ১১.২১ শতাংশ। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে ১৩টি সাধারণ আসনে বিজয়ী নারী প্রার্থীদের মধ্যে পাঁচ জন প্রার্থী ১১টি আসনে নির্বাচন করে বিজয়ী হন। (ওই ১১টি আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জয়লাভ করেন তিনটি আসনে, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া জয়লাভ করেন পাঁচটি আসনে।(গৌতম মন্ডল ২০০৩) [৯]। অন্য তিন আসনে জয়লাভ করেন, আওয়ামীলীগের মতিয়া চৌধুরী, বিএনপির খুরশিদ জাহান হক এবং জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ।

পরবর্তী সংসদে নারী সদস্যদের ওই প্রতিনিধিত্বের হার আরও হ্রাস পায়। ২০০১ সালে গঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব মাত্র ২ শতাংশ আসনে। সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অষ্টম জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ৮ জন নারী (উপ-নির্বাচনে একজন)।অন্যদিকে, বিভিন্ন সরকার আমলে মন্ত্রিসভায় নারী সদস্যের সংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, আনুপাতিক হারে মন্ত্রিসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল শেখ হাসিনার শাসনামলে। ওই সময়ে মন্ত্রিসভায় সদস্য ছিলেন ৪ জন নারী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

Dhaka University Institutional Repository

শাসনামলে মন্ত্রিসভায় নারী সদস্য ছিলেন ২ জন (৪ শতাংশ), জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ৬ জন (৬শতাংশ), হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে ৪ জন (৩ শতাংশ), বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ৩ জন (৫ শতাংশ), শেখ হাসিনার শাসনামলে৪ জন (৮.৬৯ শতাংশ) এবং আবার বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ৩ জন (৫ শতাংশ) ।(গৌতম ২০০৩)[১০]

টেবিল-১

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার আমলে মন্ত্রিসভায় নারী সদস্য সংখ্যা

সরকার আমল	মন্ত্রিসভায় মোট সদস্য	মন্ত্রিসভায় মোট পুরুষ সদস্য	মন্ত্রিসভায় মোট নারী সদস্য	শতকরা হার
শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২-৭৫)	৫০	৪৭	২	৪%
জিয়াউর রহমান (১৯৭৯-৮২)	১০১	৯৫	৬	৫.৯৪%
হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২-৯০)	১৩৩	১২৭	৪	৩%
বেগম খালেদা জিয়া (১৯৯১-৯৬)	৩৯	৩৬	৩	৭.৬৯%
শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০১)	৪৬	৪২	৪	৮.৬৯
বেগম খালেদা জিয়া (২০০১-২০০৬)	৬০	৫৭	৩	৫%
শেখ হাসিনা ২০০৯-২০১৪	৩৮		৫	১৩.১

সূত্র: Nazmunnessa Mahtab, Women in Politics (A Keyote Paper)[11]

এখানে উল্লেখ্য যে, সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যরা নির্বাচিত হতেন সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা। ফলে যে দল যখন নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, তখন সেই দল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ওই সব মহিলা সদস্য।

স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭৩ সালে গঠিত দেশের প্রথম সংসদে আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয় এবং সংরক্ষিত আসনে ১৫ জন মহিলা নিজের দল থেকে মনোনীত করে। এরপর ১৯৭৯ সালে গঠিত দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে ২০৭টি আসন পেয়ে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয়ে ঠিক একই কাজ করে। অর্থাৎ সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নিজ দল থেকে মনোনীত করে। তবে পঞ্চম জাতীয় সংসদে (১৯৯১) ১৪০টি আসন পেয়ে বিজয়ী বিএনপি তৎকালীন সরকারের শরিক দল জামায়াতে ইসলামীকে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের মধ্যে দু'টি আসন ছেড়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। আর সপ্তম জাতীয় সংসদে (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন পেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয়ে সরকারের শরিক জাতীয় পার্টিকে তিনটি সংরক্ষিত মহিলা আসন ছেড়ে দেয়। এক্ষেত্রে সমস্যা হলো, সংরক্ষিত আসনে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলারা যেহেতু কোন একটি রাজনৈতিক দলের আনুগত্য নিয়ে সংসদে আসেন, তাই তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের কোন সুযোগ ছিল না। শুধু মনোনয়ন প্রদানকারী দলের সিদ্ধান্তে তাদেরকে সমর্থন যোগাতে হয়েছে। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কোন সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারেননি। ফলে ক্ষমতাসীন দল সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনকে এতোদিন নিজস্ব 'ভোট ব্যাংক' হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন বিল পাস করিয়ে নিয়েছে।

রাজনীতিতে নারীর সম্পৃক্ততার আরেকটি দিক হলো, রাজনৈতিক দলে তাদের প্রতিনিধিত্ব। এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব খুবই সীমিত' যদিও দেশের সবচেয়ে বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পদে রয়েছেন দু'জন নারী। দেশের শীর্ষ পর্যায়ের চারটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ও জামায়াতে ইসলামীকে বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, কোন দলেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নেই। দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর উপস্থিতি খুবই কম। দেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি প্রেসিডিয়ামে রয়েছেন মোট ১৪ জন। তার মধ্যে নারী সদস্য মাত্র ৪ জন। আর বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিএনপির নীতি নির্ধারণ বিষয়ক সর্বোচ্চ কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ১২ জন; তার মধ্যে নারী রয়েছেন মাত্র এক জন।

শেখ হাসিনা সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" ঘোষণা। ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেন। নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণার কারণ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে তখন বলা হয়, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কোনভাবেই উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই সমাজের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন ও অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন এ সম্পর্কে সকলের স্পষ্ট ধারণা। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় বলা হয়-

- রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

- নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- বাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হওয়ার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেয়া।
- স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রী পরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

সপ্তম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সংসদে একটি বিল উত্থাপন করেন। কিন্তু সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় আওয়ামী লীগের পক্ষে একা তখন বিলটি পাস করানো সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে বিরোধী দলের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিরোধী দল সংসদে হাজির হয়ে উত্থাপিত সেই বিলের প্রতি সমর্থন জানায়নি। ফলে সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যবস্থা বহাল রাখা আর সম্ভব হয়নি। সপ্তম সংসদেই ওই পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটেছে। এভাবে নারী ইস্যুতে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নেত্রীর মধ্যে সমঝোতার অভাব নারী সমাজের স্বার্থ ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে।

৩.৫ রাজনীতি ও নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারী

বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধান (ধারা ৬৬, ১২২) নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রদান সত্ত্বেও রাজনীতিতে নারী পুরুষ সমপর্যায়ে নেই। বাংলাদেশের বাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের অভিনব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলেরই নেতৃত্বে দু'জন নারী। কিন্তু জাতীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনের সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ। নারীর এই অধস্তন অবস্থানের জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো যেমন দায়ী তেমনি দায়ী সনাতনী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি।

বর্তমানে এনজিও কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি উপাদানের ফলে নারী সমাজের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও এ ব্যাপারে সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী এবং নির্বাহী কমিটিতেও লক্ষ্য করা যায় নারীর স্বল্পতা। ফলে, এভাবে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর এই প্রান্তিক অবস্থানের প্রতিফলন ঘটে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে। সংবিধানের ৬৫নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী-পুরুষ উভয়েই সরাসরি ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। সংরক্ষিত ৩০টি আসনে মহিলারা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দলের সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সনের সপ্তম সংসদীয় নির্বাচনে ১৩টি রাজনৈতিক দল ৩২জন নারী প্রার্থীকে নির্বাচনীর এলাকায় দাঁড়ানোর জন্যে মনোনীত করেন; তার মধ্যে মাত্র ৫জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হন ১১টি নির্বাচনী এলাকা থেকে। নবম জাতীয় সংসদে ৫৮ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে যার মধ্যে ২২ টি আসনে ১৯ জন নারী প্রার্থী জয়লাভ করে।

৩.৬ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বে নারীদের ক্ষমতায়নে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল সংগঠন নারীবাদী লেখক ও কর্মীগণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। নারীবাদী লেখক, নারী সংগঠনসমূহ লিঙ্গীয় সম্পর্কের পরিবর্তন অর্থাৎ লৈঙ্গিক বৈষম্য বিলোপ সাধনকে নারীর ক্ষমতায়নের উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। তৃণমূল সংগঠনসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে। Marty Chen [১২] ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাবি আদায় এবং উচ্চ মজুরি বা ইতিবাচক শর্তযুক্ত কাজের জন্য দাবি জানানোর সামর্থ্যকে 'রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য গবেষক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দেখেছেন সচেতনতা ও আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে। সচেতনতা নারীদেব স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে; অপরদিকে আন্দোলনই নারীদের ক্ষমতা চর্চার নির্দেশক।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি। কিন্তু চলমান লিঙ্গীয় বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব কিনা তাই এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

৩.৭ পিতৃতন্ত্র ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

সাম্প্রতিককালে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বহুল আলোচিত প্রপঞ্চটি হচ্ছে 'মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন'। ক্ষমতায়নের বিষয়টি এসেছে ক্ষমতাহীনতা থেকে। দীর্ঘকাল যাবৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা অধস্তন ভূমিকা পালনসহ প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। পরিবারের কর্তা হিসেবে প্রথমে পিতা, পরে

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী নারীর মনোজগতের উপর এমন প্রভাব ফেলে যার ফলে নারীর নিজস্ব কোনো মতামত বা ইচ্ছা থাকে না। নারীর মনোজগতের উপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ তার মতামতকে করেছে অধীনস্ত।

পিতৃতন্ত্রের বিপরীতে নারী-পুরুষের সাম্য, সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীবাদের উদ্ভব ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীতে শক্তিশালী রূপ ধারণ করে উদারনৈতিক নারীবাদের ধারা। বিদ্যমান সমাজ কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে পুরুষদের মতো নারীরও সমাজ অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করাই হলো এর মূল বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীতে উদারনৈতিক নারীবাদের মূল দাবি হয়ে উঠে ব্যক্তিগত অধিকার, ভোটের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, নির্বাচন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা লাভ। এসব ধারণা থেকেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রপঞ্চটি উৎসারিত। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারণা অতি সাম্প্রতিককালের।

নারীবাদী আন্দোলন পিতৃতন্ত্রে পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি, নমনীয় করেছে মাত্র। পাশ্চাত্যে পিতৃতন্ত্র যখন কঠোর থেকে নমনীয় হতে থাকে, প্রাচ্যে তখন কঠোরই থেকে যায় এবং নারীরা অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবন-যাপন করে। বাঙালি সমাজে উনিশ শতকে নারীপ্রশ্ন নিয়ে রাজা রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, সত্যেন ঠাকুরের বিভিন্ন উদ্যোগ ও লেখার মধ্য দিয়ে যে সামাজিক টানাপোড়েন দেখা দিয়েছিল তা বস্তুত শিক্ষিত অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা দিয়ে নারী বিষয়ক ধর্মীয় সামাজিক বিধি বিধান সংস্কারের জন্য যে আওয়াজ তুলে ছিলেন তা বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন এবং শিক্ষা ও কাজের অধিকারের ইস্যুতে এসে মোটামুটি স্থবির হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদ, পুরুষতন্ত্র, ধর্মীয় শৃঙ্খল এবং শ্রেণী শোষণকে সমন্বিত করে দেখার অর্ন্তদৃষ্টি অর্জন করেছিলেন বেগম রোকেয়া , যা তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে স্পষ্ট। রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে যেমন চেষ্টা করেছেন, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শে আচ্ছন্ন দুর্বল নতজানু আত্মসম্মান বোধহীন নারী সমাজকে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করার চেষ্টা করেছেন। রোকেয়ার এসব লেখার কোনো প্রভাব তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনে দেখা যায় না। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, সত্যেন ঠাকুর কিংবা বেগম রোকেয়া ধর্মীয় বিধি-বিধান সংস্কারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনসমূহ পুরুষবেষ্টিত থাকায় তাদের চেতনার মধ্যে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কোনো স্থান ছিল না।

সত্যিকার অর্থে প্রাচ্যে পুরুষতন্ত্র প্রথমে নারীদের লেখা-পড়া শেখাতেই রাজি হয় নি, বা মুর্খের মতো কিছুটা ধর্মশাস্ত্র শিখিয়েছে, পরে যখন বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে তখনো বের করেছে বিশেষ এক

Dhaka University Institutional Repository

ধরণের নারী শিক্ষা। ভারতবর্ষে নারীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ যেমন পেয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায় তেমনি রাজনীতিতে বিশেষত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ ।

ভারতে স্থানীয় সরকারের বিধিবদ্ধ কাঠামোর গোড়াপত্তন ঘটে ব্রিটিশ শাসনামলে, তখন নারীদের কোন ভোটাধিকার ছিল না। পরবর্তীকালে শুধুমাত্র শর্তসাপেক্ষে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়, যারা ছিলেন ধনী অভিজাত পরিবারভুক্ত। তারও পরে স্থানীয় সরকারে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। সংরক্ষিত আসনে নারীরা পুরুষদের ইচ্ছায় মনোনীত হতেন।

৩.৮ নারীর দাবি এবং রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর কয়েকটি উপাদান দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যা ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রতিফলিত হয়। সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিক সমন্বয়মূলক জেন্ডার রাজনীতির কাঠামো বজায় থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদারনৈতিক গণতন্ত্র উভয়েই রাজনৈতিক সাম্য ও জেন্ডার সমতার ভিত্তি রচনা করে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা মতাদর্শ হওয়ার চাইতেও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী অস্ত্র হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সমতাভিত্তিক জেন্ডার বা লিঙ্গীয় সম্পর্কের কাঠামো গড়ে উঠেনি। দ্বিতীয়ত, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিও অনেকটাই নাজুক ছিল। রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে বিশেষত অশীদারী করা বা জেন্ডার প্রশ্নে কার্যকরী পদক্ষেপ অনুপস্থিত ছিল। তৃতীয়ত, পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও মূল্যবোধের প্রবল প্রভাব পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় পরিমণ্ডলের মধ্যে বিভেদ অব্যাহত রাখে। উপরিউক্ত তিনটি উপাদান জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ ও কর্মচর্চার নিয়ামক হয়। একদিকে বিমূর্ত নাগরিক হিসেবে তার মর্যাদা, অপরদিকে পাবলিক ও প্রাইভেট পরিমণ্ডলের পৃথকীকরণে এবং জেন্ডার সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট কাঠামোর অনুপস্থিতি নারীকে দ্বিধাগ্রস্ত করে। অধিকন্তু দেশের রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পাওয়ায় অধিকাংশ বঞ্চিত গোষ্ঠীসহ নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি।

ফলশ্রুতিতে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নারী উপস্থিতি পুরোপুরি নেতিবাচক না হলেও ক্ষীণ ছিল। লক্ষণীয় যে স্বাধীনতা যুদ্ধে ধর্ষণের শিকার দুই লক্ষ বীরাঙ্গনা নারীর স্বার্থ উদ্ধার অস্পষ্ট থেকে যায়। নারীদের জন্য প্রণীত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ যেমন সংসদে ১৫টি সংরক্ষিত আসনে নারীর পরোক্ষ প্রতিনিধিত্ব, ধর্ষিতাদের জন্য সরকারি চাকুরির শতকরা ৫ ভাগ কোটা পদ্ধতি (যা সামাজিক অপবাদের প্রেক্ষিতে

Dhaka University Institutional Repository

কখনো পূরণ করা যায় নি) ইত্যাদি নারীর প্রকৃত দাবির প্রতিফলন ঘটায় নি। পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত সম্মান ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হলেও দেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী নারী যোদ্ধাদের বেলায় তার অনুপস্থিতি ছিল। মাত্র '৮০র দশকের দিকে বিলম্বে হলেও নারী সংগঠনগুলো নারী মুক্তিযোদ্ধাদের এক সমাবেশে তাদের দুর্দশা তুলে ধরেন (ফরিদা আখতার, ১৯৯১)[১৩]। আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদানকেও বিবেচনায় আনা হয় নি। দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে পুরুষতান্ত্রিক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। উভয় পরিকল্পনায় নারী সম্পর্কিত নীতিকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা তথা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও এতে নারীর ভূমিকা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় (FFYP:১৯৭৩-৭৮ ও SFYP: ১৯৮০-৮৫) [১৪]।

বস্তুত, সদ্য প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রান্তিলগ্নে বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংসদের অভ্যন্তরে বা বাইরে নারীরা তাদের কণ্ঠস্বর জাগ্রত করতে সক্ষম হন নি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও সহিংসতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে কোন সংগঠিত প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় নি। আবার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও এজন্য ত্বরিৎবেগে সাংবিধানিক সংশোধনকালেও (দিলারা চৌধুরী, ১৯৯৪)[১৫] নারীকণ্ঠ সোচ্চার হয় নি। যদিও এক দলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা ১৯৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে কার্যকর করা হয় নি তথাপি উল্লেখ্য যে 'মনোলিথিক' রাষ্ট্রে যেখানে রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের মধ্যে কোনরূপ স্বতন্ত্রীকরণ নেই সেখানে নারীসহ সাধারণ নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ সীমিত।

দেশে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের পর সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান যিনি কোন্দো কোনো ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকারের বিনিময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি ১৯৭৮ সালে 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রে সামরিক বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য কায়েম হয়। উক্ত কাঠামোয় রাষ্ট্রের পিতৃতান্ত্রিক নীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ফলে উন্নয়নমূলক ও সংরক্ষণবাদী এ্যাপ্রোচের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহের পদক্ষেপ নেয়া হয়। যেমন, মহিলা বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় স্থাপন; সংসদে মহিলাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৫ থেকে ৩০ করা; সিভিল সার্ভিসে ১০ শতাংশ নারী কোটার বিধান ইত্যাদি। তাছাড়া রাজনীতিতে নারী অন্তর্ভুক্তি সহজ করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে একটি নারী শাখার নিয়ম চালু করা হয়। এ সকল সিদ্ধান্তই নারীর প্রকৃত দাবি অনুসারে না হয়ে রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃক প্রণীত হতো।পরবর্তী সামরিক স্বৈর শাসক জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্র কাঠামো, কৌশল নির্ধারণ ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়াত জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। একইভাবে নিজস্ব দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নারীকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত না করে নারী নীতিকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তবে তিনি অধ্যাদেশের মাধ্যমে কতগুলি নিরাপত্তামলূক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যাতে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধীদের শাস্তিস্বরূপ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে অকার্যকর প্রতিষ্ঠান যেমন কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন, কোন্দলপূর্ণ দলীয় ব্যবস্থা এবং বশংবদ সংসদের কারণে নারীদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার ওপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না।

৩.৯ নারী নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রে পদক্ষেপ

১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নব আশার সঞ্চার করে। এ সময় জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর সংহতকরণ এবং গণতন্ত্রায়নে সিভিল সমাজের ভূমিকা পালন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তবে দুঃখজনকভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংহতকরণ সমস্যাসংকুল হয়ে পড়ে। আর তা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যকার অবিশ্বাস ও সহনশীলতার অভাবের কারণে যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা থেকে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে উত্তরণ দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৯১ সাল থেকে দেশের নেতৃত্বে নারীর উপস্থিতি সত্ত্বেও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিপ্লাবাত্মক পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয় নি। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে যেহেতু নারী নেতৃত্ব পিতৃতন্ত্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত হয় সেহেতু নারী প্রশ্নে রাষ্ট্র কাঠামোয় বিশেষ কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না। তবে কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন, নারীদের নিরাপত্তার জন্য বিদ্যমান আইনের কঠোরকরণ;ম্যাক্রো বা ব্যষ্টিক কাঠামোতে নারী উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তকরণ ও ৫ম পঞ্চবার্ষিকী (১৯৯৫-২০০২) পরিকল্পনায় জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করণের ব্যবস্থা গ্রহণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে নারী উন্নয়ন (WID) বিষয়ক বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। বর্তমান নারী নেতৃত্ব ১৯৯৭-এর সেপ্টেম্বরে সংসদীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষভাবে নারী সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা বলবৎ করে যা তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করতে ভূমিকা রাখে। তবে জাতীয় পর্যায়ে নারীর প্রত্যক্ষ ও কার্যকর প্রতিনিধিত্বের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি গৃহীত হয় নি। ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হওয়ার পরও নারী প্রশ্নে মৌলিক পদক্ষেপ তেমনভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

৩.১০ আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে নারীর মৌলিক দাবি পূরণ সহজসাধ্য নয় যা রাজনৈতিক সমতা প্রশ্নে নারীবাদীদের আশংকাকেই প্রতিষ্ঠিত করে (এ্যান ফিলিপস, ১৯৯২)[১৬]। তবে ইতোমধ্যে চলমান জেন্ডার বৈষম্য ও

Dhaka University Institutional Repository

মূলধারার রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিকীকরণের কারণে নারী কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী নারী

আন্দোলনের ফলশ্রুতি। দেশজ নারী সম্পর্কিত ইস্যুতে নব সংগঠন ও সাংগঠনিক আচরণ (জাহান, ১৯৮৯)[১৭] নারী আন্দোলনের ক্ষেত্র রচনা করেছে যা নারী উদ্বুদ্ধকরণে বিকল্প ধারার ইঙ্গিতবাহী।

আশির দশকে সমাজসেবা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ দানে নিয়োজিত শতাধিক সংগঠন ছাড়াও নতুন নতুন নারী সংগঠনের উত্থান ঘটেছে। নতুন এসব নারী সংগঠনের চলমান বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি রয়েছে। নারীদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌতুক ও কতোয়াজনিত মৃত্যু, নারী পাচার, এসিড নিক্ষেপ, বৈষম্যমূলক মজুরি, শিল্পে বিশেষত পোশাকশিল্পে নারীশ্রম শোষণ, নারী শ্রমিকদের প্রতি ট্রেড ইউনিয়নের উদাসীনতা, উৎপাদনের উপায় ও উপকরণে নারীর অধিকারহীনতা ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে তুলে ধরে সমাধান দাবি করা হচ্ছে।

নারী সহিংসতার মতো ঘটনার প্রতিবাদে সংগঠিত নারী সমাজ ও কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৫ সালে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমীন ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে নারী সংগঠনগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ঘটনা বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে উত্থাপিত হয়েছিল এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র বিষয়টিকে বিশ্ব নারী ফোরামে তুলে ধরে। সাম্প্রতিককালে পুলিশের হেফাজতে সীমা চৌধুরীর ধর্ষণ ও মৃত্যু হওয়ার ঘটনাও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এছাড়াও বিশিষ্ট শিল্পপতির তরুণীকন্যা শাজনীন হত্যার মতো ঘটনাগুলো বিভিন্ন নারী সংগঠনকে সম্মিলিতভাবে নারী সহিংসহার বিরুদ্ধে 'প্ল্যাটফর্ম অব এ্যাকশন' গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। 'ইয়াসমীন দিবস' এভাবে নারীর বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের স্বাক্ষর হিসেবে পরিচিত। সংগঠিত নারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্ক করতে তৎপর এবং সৃষ্ট জনমতের প্রেক্ষিতে আদালত প্রাঙ্গণে ছয় বছর বয়সী তানিয়ার ধর্ষণকারীর মৃত্যুদণ্ডের দাবি জোরদার করে। 'ইয়াসমীন দিবস' পালনের সমর্থনে বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রতিষ্ঠান এভাবের সদস্যগণ প্রতিটি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে র‍্যালীর আয়োজন করে এবং এর কেন্দ্রীয় সংস্থা ইয়াসমীন হত্যার জন্য আদালতের রায়ের প্রসঙ্গে এক জরুরি সভার আহ্বান করে (এডাব বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৭-৯৮)[১৮]। এযাবৎ নারীর দুর্দশা লাঘবে সরকারে গৃহীত নীতিমালা যেমন কার্যকর হয়নি তেমনি আক্রান্ত নারীদের বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের সাহায্য, সমর্থন, আশ্রয় বা বিকল্প জীবন-যাপনে সহায়তা দানের জন্য নারী সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টাও বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নারী সংগঠন ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত 'প্ল্যাটফর্ম অব এ্যাকশন'-এর প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রে নারী দাবি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা এখানে প্রণিধানযোগ্য। নারী অধিকার আদায়ের সচেতনতা সৃষ্টিতে নারী দশক (১৯৭৫-৮৫) সহায়ক ভূমিকা রাখে। ১৯৭৯ সালে গৃহীত নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘ সনদ বা CEDAW এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মেক্সিকো (১৯৭৫), নাইরোবি (১৯৮৫) এবং বেইজিং (১৯৯৫)-এ অনুষ্ঠিত তিনটি বিশ্ব নারী সম্মেলন ও সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে। আশির দশকের শেষপর্বে বিশটি নারী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত জোট ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ সতের দফা দাবি জানায়। উক্ত দাবিসমূহের মধ্যে ছিল নারীর সমান অধিকার, CEDAW-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন, সমরূপ সিভিল কোড, সরকারি চাকুরিতে কোটা বৃদ্ধি, পোশাকশিল্পের নারী শ্রমিকের সমান মজুরি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) অনুমোদিত বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ সন্তান প্রসবকালীন ছুটি, ভূমিহীন ও শহুরে দুঃস্থ নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ, গৃহকর্মে নিযুক্ত পরিচারিকারদের মজুরির ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ জোটের কর্মসূচি নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবি একত্রীকরণে এক বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ জোট ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা বিষয়ক ১৯৮৮ সালের সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানায় এবং ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে । ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। নারী পক্ষ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিলের জন্য সুপ্রিমকোর্টে রিট পিটিশন করে। মহিলা পরিষদ নিজস্ব 'লিগাল এইড সেল' এবং নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে CEDAW-এর পূর্ণ বাস্তবায়নসহ নারী এজেন্ডা এগিয়ে নিতে তৎপর থাকে।

ধর্মীয় প্রতীক ও রাষ্ট্র ক্ষমতার সংমিশ্রণের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত কর্মকান্ড ও আন্দোলন একই সাথে সমাজে বিদ্যমান নারী অধস্তনতার বিপক্ষে নারীদের সজাগ হওয়ার ইঙ্গিতবাহী। এর অংশ হিসেবে একজন মহিলা রাজনৈতিক কর্মীর জনসমক্ষে পুলিশ কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ার বিরুদ্ধে নারীদের বিক্ষোপ প্রদর্শিত হয়। এভাবে নারীসহ সচেতন সমাজের প্রতিবাদের মুখে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কনস্টেবলকে সাময়িকভাবে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয় (ডেইলি স্টার, ১৯৯৯)[১৯]।

নারীর চলমান আন্দোলনে আরেক অন্যতম বিষয় হল অর্থনৈতিক অধিকার আদায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে নারীর শ্রম শোষণ দূরীকরণে নারী সংগঠনগুলোর দাবি জোরালো হতে পারে নি। ১৯৯৩ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী নারী দেশের মোট শ্রমশক্তির ১৮.৭ শতাংশ এবং এর এক

Dhaka University Institutional Repository

বড় অংশ দেশের পোশাকশিল্পে নিয়োজিত। বাংলাদেশে ২,৬০০ পোশাকশিল্পের ১৪ লক্ষ শ্রমিকের ৮৫ শতাংশই নারী। এ শিল্প বৈদেশিক মুদ্রার ৭০ শতাংশ উপার্জন করে। এছাড়া রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমশক্তি নারী শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত। ফলে নারীরা সংগঠিত শ্রমবাজার এবং নগদ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু নারীরা ন্যূনতম অধিকার ভোগ করতে পারেন না। এমনকি তাদের জন্য বিদ্যমান অপর্যাপ্ত বিধানও পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় না। এক্ষেত্রে নারী শোষণের উদাহরণ হল বৈশম্যমূলক মজুরি, ওভারটাইম বা বাড়তি খাটুনি ব্যতিরেকে দীর্ঘকালীন কর্মসময়, প্রসবকালীন ছুটি না দেওয়া, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সুষ্ঠু অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার অভাব বা অসংখ্য নারী শ্রমিকের মৃত্যুর কারণে হয়। এ জাতীয় মৃত্যুর কারণে আইনগতভাবে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা নেই (ডেইলি স্টার, ১৯৯৮)[২০]। দলীয়ভাবে সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনও নারী শ্রমিকের দুরবস্থার প্রতি উদাসীন থাকে। কর্মজীবী মহিলা সংঘ সাংগঠনিকভাবে দেশের সমগ্র নারী শ্রমিকের প্রয়োজন পূরণার্থে কাজ করে যাচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজও তাদের ১৭ দফা দাবিতে দেশের পোশাকশিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকের চাহিদা ও প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৩.১১ সংসদে নারী

বাংলাদেশের সংবিধান নারীদের পাবলিক পরিমণ্ডলে অংশ নেয়ার অধিকার দিলেও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এ জগতে তাদের প্রবেশ নিরুৎসাহিত করে। পাবলিক পরিমণ্ডল নারী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করলেও পিতৃতন্ত্রের নিয়ম-কানুন বহির্জগতে নারীর গতিশীলতাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। পুরুষ হেজিমোনি ও কর্তৃত্ব নারীদের অধীন করে রাখার অর্থনৈতিক সম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত হন এবং ঘরের বাইরে সামাজিকভাবে মেলামেশা ও আদান-প্রদানের সুযোগ পান না (হোসাইন, ১৯৯৩)[২১]। কাজেই রাজনীতির জন্য আবশ্যক অর্থনৈতিক ক্ষমতা, অবসর, যোগাযোগ রক্ষা বা গতিশীলতা নারীর থাকে না। পুরুষের স্বার্থেই আইন প্রণীত হয় এবং নারী মর্যাদার বিষয়টি পুরুষনির্ভর বলে গণ্য হয়। নারীর অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সেজন্য পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ওপর নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিতে গৃহকোণ থেকে আইনসভা পর্যন্ত নারীর রাজনৈতিক যাত্রাও পিতৃতান্ত্রিক আইনের পথ ধরে চলে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে রাজনীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সীমিত অংশগ্রহণ, অধস্তন মর্যাদা এবং পারিবারিক, সামাজিক বা জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতাহীনতার প্রেক্ষাপটে আইনসভায় নারীর কর্মকাণ্ডের বিষয়টি দেখতে হবে। আইনসভায় নারীর ভূমিকা সম্পর্কে পঞ্চম জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর রচিত এক গবেষণার কিছু উদাহরণ এখানে প্রণিধানযোগ্য। "নারী

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে পেশা হিসেবে নিতে পারে না কারণ তার প্রধান দায়িত্ব পরিবারে নিহিত আর তাই রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক সংখ্যক নারীকে মনোনয়ন দিতে পারে না।নারীদের প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা দলীয় সভা অনুষ্ঠানের পরিবর্তে উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ নেয়া উচিত। নারীদের দাবি পেশার জন্য রাজনীতি সঠিক মাধ্যম নয়, কারণ রাজনীতি নোংরামিতে পূর্ণ যা নারীদের সাজে না।

স্বামীর সাহায্য ছাড়া নারীরা ঘরের বাইরে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারে না। একইভাবে আইনসভায় নারী সাংসদদের পুরুষ সহকর্মীদের সার্বক্ষণিক সহায়তার প্রয়োজন হয়।রাজনীতির কারণে নারীদের পারিবারিক দায়িত্ব পালন উপেক্ষিত হলে স্বামী বা পরিবারের সাথে মানিয়ে চলতে হয়। অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে পুরুষ সহকর্মীরা নারীদের পক্ষে কাজ চালিয়ে নেয় ।নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে নারীদের স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মেধাসম্পন্ন হতে হয়।রাজনীতিতে মহিলাদেরকে অসাধারণ হিসেবে প্রমাণ করা দুষ্কর হয়। কেননা, অধিকাংশ নারীই পরিবার বা সমাজসৃষ্ট বাধা অতিক্রম করতে অপারগ।

বিভিন্ন গবেষণায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারীদের প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে (চৌধুরী, ১৯৯৪; আমিন, ১৯৯৬)[২২]। উল্লিখিত সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমর্থনের অভাব। নারীদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা লাভের জন্য পুরুষ আত্মীয় বা জ্ঞাতির কাছে হাত পাততে হয়। কোন অনাত্মীয় পুরুষের কাছে আর্থিক সহায়তা চাওয়া নারীর জন্য কঠিন কারণ তাতে প্রার্থীর সামাজিক ইমেজ ক্ষুন্ন হতে পারে। রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার জন্য জনসমাগম হয় এমন জায়গায় যেমন- বাজার, হাট, চায়ের দোকান ইত্যাদি স্থানে নারীর প্রবেশাধিকার সীমিত। তাছাড়া দূরাঞ্চলে বা নৈশকালীন যাত্রার ক্ষেত্রে মুক্তভাবে বিচরণ মহিলাদের জন্য সামাজিকভাবে অনুমোদিত নয়। এ সমস্ত কারণে নির্বাচনী প্রচারের জন্য পুরুষের ওপর নারী প্রার্থীর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনের সময় সহিংসতা বা সন্ত্রাসের কারণে পরিবারের পুরুষরা রাজনীতি থেকে নারীকে বিরত রাখার উপযুক্ত ওজুহাত খুঁজে পায়। তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়ার ভয়ে মহিলা প্রার্থীগণের পক্ষে নারী উন্নয়ন, নারী অধিকার লঙ্ঘন বা নারী নির্যাতনের মতো মৌলিক বিষয়গুলো প্রকাশে ভোটারদের কাছে তুলে ধরা সম্ভবপর হয় না।

সাধারণভাবে নির্বাচনী রাজনীতিতে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীগণ অর্থ ও সমর্থনের জন্য পাবলিক পরিমণ্ডলে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। গতিশীলতার অভাব ও চলাফেরার সীমাবদ্ধতার কারণে মহিলা প্রার্থীগণ নির্বাচনী প্রচারকার্যে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর অনভিজ্ঞ নারী সাংসদদের আইন সভায় পুরুষ সহকর্মীর সহায়তার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া অভিজ্ঞ

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার পুরুষ সাংসদগণ নিজেদেরকে নারী প্রতিনিধির 'অভিভাবক' মনে করেন। মহিলা সাংসদকে নারী হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতে নিজস্ব অধস্তনতার কথা মনে রাখতে হয়।

৩.১২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

বাংলাদেশের নারীদের সবচাইতে স্বাভাবিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হচ্ছে নির্বাচনে ভোট প্রদান। ঔপনিবেশিক আমল থেকে সহজসাধ্য ও কম বিধি-নিষেধসম্পন্ন এই ভোটদান প্রক্রিয়ায় নারীরা অংশ নিয়ে আসছেন। পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিতে সীমিত সুযোগ থাকার কারণে নারী রাজনীতিক কর্মীরা মহিলা সংগঠনগুলোতে অংশ নেয়াকেই অধিক কার্যকর মনে করেন। তাই তাদের রাজনীতিক আভলাষ ও প্রচেষ্টাকে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত না করে নারী সংগঠন বিনির্মাণে কাজে লাগান। যেহেতু তুলনামূলকভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কম সেহেতু রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ধারায় তারা আজও প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছেন। এজন্য সংসদের সংরক্ষিত আসনে ও রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখায় তাদের অন্তর্ভুক্তি দেশের সংবিধান এবং নির্বাহী আদেশ দ্বারা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমানাধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও নারীদের পশ্চাৎপদতার কথা ভেবে আইনসভায় মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় নারীরা স্বতন্ত্র বা রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে সরাসরি নির্বাচনে অংশ নেয়ার অধিকার হারান নি। তাই বাংলদেশে নারীরা জাতীয় সংসদে দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করেছেন।

দলীয় কাঠামো এবং আইনসভায় নারীদের উপস্থিতি দেশের রজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের সংশ্লিষ্টতার পরিচায়ক। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদ ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যকার মূল যোগসূত্র হওয়ায় তাদের মনোনীত প্রার্থীগণই নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসীন হন। নির্বাচনে মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে দলীয় কাঠামোয় অবস্থান তাই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলা শাখা থাকলেও দলীয় সংগঠনে মহিলাদের অবস্থান প্রান্তিক। নারী নেতৃত্বাধীন দলেও মহিলাদের দলগত অবস্থানে কোনো উন্নতি নেই। এ কারণে সরাসরি নিবাচনে নারী প্রার্থিতা প্রান্তিক থেকে গেছে। ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ০.৩%, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে মোট ২,১২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ১৭ জন। ফলে মূল ধারার রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ ০.৩ থেকে ০.৯%-এ উঠে আসে। ১৯৭৯ সাল থেকেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি নির্বাচনে নারী

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে শুরু করে। এভাবে ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে যথাক্রমে ১৩(.০৯%), ১৫(১.৩%), ৭(০.৭%) এবং ৪০ (১.৫%) জন নারী প্রার্থীকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়।

১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩টি রাজনৈতিক দল ৩২ জন নারীকে সরাসরি নির্বাচনে দাঁড় করায়। সর্বমোট ৩৬ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে গণফোরাম থেকে সর্বোচ্চ ৭জন, আওয়ামী লীগ থেকে ৪ জন, বিএনপি থেকে ৩ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ৩জন, ক্ষুদ্র দলগুলোর ১৫ জন এবং স্বতন্ত্র ৪ জন নির্বাচনে অংশ নেন। এ সকল মহিলা প্রার্থী মোট ৪৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উল্লেখ্য সরাসরি আসনে মনোনয়ন দেয়নি। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে ৫জন নারী ১১টি নির্বাচনী এলাকায় বিজয়ী হন। এভাবে আওয়ামী লীগ, বি,এন পি ও জাতীয় পার্টির এ সকল নারী প্রার্থী তাদের পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা এবং বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া যথাক্রমে ৩টি ও ৫টি আসনে বিজয়ী হন। আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী, বিএনপির বেগম খুরশীদ জাহান হক ও জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ বাকি ৩টি আসন থেকে জয়ী হন। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সংসদের উপ-নির্বাচনে জাতীয় পার্টির বেগম তাসমিমা হোসেন এবং বিএনপির মমতাজ বেগম নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যক্ষ আসনে নারী সদস্যদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ২ জন, ১৯৮৮ তে ৪ জন, ১৯৯১ তে ৫ জন এবং ১৯৯৬ সালে ৭ জন,বর্তমানে ১৯ জন।

সংসদের সংরক্ষিত আসনগুলো যোগ করলে আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার বৃদ্ধি পায়। তবে নির্বাচিত সাংসদদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান থাকায় সংরক্ষিত আসনগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দখলে যায়। বাংলাদেশের প্রথম তিনটি সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সকল সদস্যই ছিল সরকারি দলের। সংবিধান অনুযায়ী মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে ৪র্থ সংসদে কোনো সংরক্ষিত আসন ছিল না। ৫ম সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিএনপি সরকার গঠনে জামায়াত-ই ইসলামীর সমর্থনের বিনিময়ে ২টি সংরক্ষিত আসন জামায়াতকে দেয়। ৭ম জাতীয় সংসদে বিজয়ী আওয়ামী লীগ ঐকমত্যের সরকারের নামে ৩টি সংরক্ষিত আসন জাতীয় পার্টিকে দিয়েছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মহিলা আসন ৩৬ টি,বিএনপির ৫টি এবং জাতীয় পার্টির ৪ টি ।বলাবাহুল্য যে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদদের দলের পুরুষ নেতৃত্বের অধীনস্থ করে এবং তারা সরকারি দলের ভোটব্যাংক হিসেবে কাজ করেন। এই নির্ভরশীলতা সম্পর্কের কারণে ও সার্বিকভাবে গুরুত্বহীনতার দরুন সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের 'ত্রিশ সেট অলঙ্কার' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। চৌধুরী ও জামান (১৯৯৭:৬০)[২৩] বলেন যে মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

সাংসদদের জনপ্রতিনিধিত্বশীল হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। কেননা, তাদের নির্বাচনী এলাকা সাধারণ আসন থেকে দশগুণ বড়। বর্তমান ব্যবস্থায় এসব নারী সাংসদদের পক্ষে নির্বাচনী এলাকার সাথে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর নয় যা তাদের অবস্থানকেই দুর্বলতর করে এবং কার্যকারিতা হ্রাস করে। যেহেতু পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদগণ নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি নন তাই সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে।

৩.১৩ পঞ্চম জাতীয় সংসদে নারী

লক্ষ্য করা গেছে যে ৭ম জাতীয় সংসদের আগে বাংলাদেশে অতীতের কোনো সংসদই রাজনৈতিক আন্দোলন ও জটিলতার কারণে পূর্ণ মেয়াদের কাজ করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে সংসদের কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাবসহ পুরুষ সহকর্মীর মতো নারী সাংসদদেরও সংসদীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রথম চারটি সংসদে নারী সাংসদদের ভূমিকা ছিল গৌণ এবং নিম্ন অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত আগাগোড়াই বজায় থাকে। পঞ্চম সংসদের নারী সদস্যগণের ভূমিকা দৃশ্যমান হলেও তা আইনপ্রণয়ন কর্মকাণ্ডে কোনো গুণগত পরিবর্তন আনে নি। তবে তারা সাধারণভাবে সংসদের কার্যক্রমে অংশ নেয়ার প্রচষ্টা চালিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রভাব বিস্তারে প্রচেষ্টা চালান।

কিছু মহিলা সাংসদ রাষ্টপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নেন ও বাজেট এবং সম্পূরক বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। তার অর্থ বিল, পেনাল কোড (সংশোধনী) বিল, জেল পরিস্থিতি আলোচনা, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। আওয়ামী লীগ ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ কিছু মহিলা সদস্য জাতীয় মহিলা সংস্থা বিলের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করে মতামত দেন। নারী সাংসদদের পক্ষ থেকে অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রম যেমন প্রশ্নোত্তর পর্ব, মুলতবি প্রস্তাব, অর্ধঘন্টা আলোচনা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ ছিল প্রান্তিক (চৌধুরী ও জামান, ১৯৯৭: ৬০-৬২)[২৪]। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৩তম অধিবেশনের পর থেকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও বিরোধী দলের অবিরাম সংসদ বয়কট এ সংসদের কর্মকাণ্ডকে ম্লানসহ সাংসদদের ভূমিকাকে গুরুত্বহীন করে তোলে।

৩.১৪ সপ্তম জাতীয় সংসদে নারী

দুই বছরের রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও ১৯৯৬-এর অবাধ নির্বাচনের পর ৭ম জাতীয় সংসদের কাজ শুরু হয়। সংসদকে ঘিরে নারীসহ অন্যান্য সচেতন গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন ইতিবাচক আশার সঞ্চার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ সংসদে ৩০টি আসনের সাংসদ ছাড়াও ৭জন নারী সদস্য সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে এসেছেন।

সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাদের অনেকেরই সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে। এদের অধিকাংশই সমাজের শহুরে ধনাঢ্য অংশের এবং তাদের নির্বাচনী এলাকার সাথে যোগাযোগ ক্ষীণ। বেশিরভাগ নারী সাংসদই সমাজকর্মী এবং তারা দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক, লবিং ও জ্ঞাতি সম্পর্কের কারণে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন লাভ করেন। তাদের কয়েকজনের রাজনৈতিক পটভূমিসহ পূর্বতন সংসদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সারণি-১-এ প্রতীয়মান হয় যে, ৭ম সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদের সংখ্যা পূর্বের সংসদগুলোর চাইতে অধিক।

সারণি-১

সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উপস্থিতি

গংসদ	মোট নারী সাংসদ	অভিজ্ঞ নারী সাংসদ	শতাংশ
প্রথম (১৯৭৩)	১৫	৫	৩৩.৩
দ্বিতীয় (১৯৭৯)	৩০	৭	২৩.৩
তৃতীয় (১৯৮৬)	৩২	৩	৯.৩
চতুর্থ (১৯৮৮)	৯	৩	৭৫.০
পঞ্চম (১৯৯১)	৩৫	১২	৩৪.২
গপ্তম (১৯৯৬)	৩৭	১৪	৩৭.৮

উৎস: চৌধুরী ও জামাল (১৯৯৭:৬১)২৭ এবং সংসদ সচিবালয়, ১৯৯৭ [২৮]

চতুর্থ সংসদে কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না।

বিতর্কিত ৬ষ্ঠ সংসদ এখানে অন্তর্ভূক্ত হয়নি।

৩.১৫ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট থেকে সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন শেখ হাসিনা, মতিয়া চৌধুরী, সাজেদা চৌধুরী, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, সারাহ বেগম কবরী, রেবেকা মমিন, সুলতানা তরুণ, নিলুফার জাফরউল্লাহ, মন্নুজান সুফিয়ান, ডা. দীপুমণি, মাহবুব আরা গিনি, সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, সানজিদা খানম, মেহের আফরোজ চুমকি, হাবিবুন নাহার এবং বেগম মমতাজ ইকবাল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের বেগম খালেদা জিয়া, হাসিনা আহমেদ এবং রুমানা মাহমুদ নির্বাচিত হয়েছেন। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া যথাক্রমে সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ

Dhaka University Institutional Repository

হাসিনা দ্বিতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। তাঁর মন্ত্রীসভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রির দায়িত্ব পেয়েছেন নারীরা। এবারের মন্ত্রিসভার ৫ নারী মন্ত্রী হলেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মণি, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান।

নারী মন্ত্রী ২০০৯

ক্রম	নাম	পদমর্যাদা	মন্ত্রণালয়
১	শেখ হাসিনা	প্রধানমন্ত্রী	এছাড়া তার দায়িত্বে রয়েছে সংস্থাপন, প্রতিরক্ষা, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, ধর্ম, গ্রহায়ন ও গণপূর্ত, মহিলা ও শিশু, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়
২	মতিয়া চৌধুরী	মন্ত্রী	কৃষি মন্ত্রণালয়
৩	অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন	মন্ত্রী	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪	ডা. দীপু মনি	মন্ত্রী	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫	মুন্নুজান সুফিয়ান	প্রতিমন্ত্রী	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

সূত্র-উন্নয়ণ পদক্ষেপ,স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট,২০০৯

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি নারী উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গীর (WID) আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পুরুষের নির্মিত রাজনীতির সংজ্ঞার বাইরে নারীর নিজস্ব রাজনীতি হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনও রাজনৈতিক। প্রচলিত রাজনীতিতে পাবলিক ক্ষেত্রে নারীর অনুপস্থিতি তাকে অরাজনৈতিক হিসেবে প্রমাণ করে না।(হোসেন,) বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Ester Boscrup প্রথম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থানের বিষয়টি মাবাত্বকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। বোজারপ বলেন যে, নারীদের আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাদ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ঐতিহ্যবাহী প্রান্তিক প্রক্রিয়া রাখা হয়েছে যেখানে পুরুষরা আধুনিক প্রক্রিয়া গেছে। তিনি আধুনিক অর্থনৈতিক খাতে নারীর নিম্ন অংশগ্রহণকে উন্নয়নের জন্য মন্দ এবং তাদের নিজেদের জন্যও খারাপ বলে অভিহিত করেছেন। (উদ্বৃত চার্লস ১৯৯৩:১৬৬)। তাই নারীর অবস্থান পরিবর্তন করতে এবং নারীদের মধ্যে উন্নয়ন পদকে।ষপের ফল ঘটাতে নীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিক হারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।

বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের গুরুত্ব পরীক্ষা করেছেন। নারীর রাজনীতিতে ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন কারণ (১) এটি গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন এবং নাগরিক অধিকারেরও বিষয়। নারীর রাজনীতিতে আনুপাতিক অংশগ্রহণের দাবি অনিবার্য (২) রাজনীতিতে নারীর তাৎপর্যহীন উপস্থিতি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ (৩) নারীদের তাদের মৌলিক সমস্যা ও চাহিদা সম্পর্কে অবগত থাকা। (৪) রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক অংশগ্রহণ অধিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সুযোগ করে দেবে। (৫) এর চূড়ান্তভাবে মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য ব্যাপক হারে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করানো উচিত।

এই অংশে বর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও মতামতে আমরা দেখতে পাই কিভাবে পণ্ডিত ও গবেষকরা রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্বের প্রতি তাদের মনোযোগ দেওয়া। আমরা জানি যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ দুই ধরণের- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক। সংসদ বড় বড় আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীর বিভিন্ন ধরণের অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত ও বিশ্লেষণ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা

১. Rahman Zarina, Political participation of women:The Problematics, p.166

২. N, Owen, "Textile displacement and the status of women in South East Asia" Special reserve, Macquarie University, Sydney, Australia, 1978.

৩. Bourdieu, Pierre, Outline of a theory of practice, Cambridge, University press, Cambridge, 1977.

৪. Khan ,Salma. The Fifty Percent: Women in Development and Policy in Bangladesh, The University Press limited, Dhaka, 1993, P-106

৫. Mandal ,Tirtha, The Women Revolutionaries of Bengal: 1905-1939, India –Minerva, 1991, P-2.

৬. Gandhi, M K. Young India, India Ganesan Triplicane, 1922, PP, 105-106

৭. মন্ডল গৌতম,বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহনে বাধা,২০০৩

৮. Women in Politics and Decision-Making in the late Twentieth Century, UNDP

৯. মন্ডল গৌতম,বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহনে বাধা,২০০৩

১০. প্রাগুক্ত

১১. Mahtab ,Nazmunnessa. Women in Politics (A Keyote Paper)

১২. Chen ,Marty. "conceptual model for women's empowerment" Draft, April 1993.

১৩. আকতার ,ফরিদা.সংরক্ষিত আসন:সরাসরি নির্বাচন,নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা,ঢাকা ।

১৪.প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা,প্লানিং কমিশন বাংলাদেশ সরকার ।

১৫. Choudhury,Dilara.Constitutional Development in Bangladesh:Stresses and strains ,Oxford University Press,Karachi 1994.

Dhaka University Institutional Repository

১৭. Jahan Rounaq. "Purdha and participation":Women in the politics of Bangladesh"in Hanna Papanek and Gail Minault (eds,) Separate world :Studies of Purdah in South Asia , Chanakya publications,New Delhi,1981.

১৮. Annual report: 1997-98, ADAB.

১৯. The Daily Star, March, 28, 1998 and May 13, 1999.

২০. The Daily Star, March, 28, 1998 and May 13, 1999.

২১. Hussain,Nassem A,Social relationship politics and role of women"Asian Studies,No 12,1993.

২২. Amin,Asha Mehrin "Why so mrginalized"The daily Star Magazine,May 31,1996.

২৩. Choudhury Dilara and Hasanuzzaman Al Masud "Political decision making in Bangladesh and the role of Women"Asian Profile, Vol 25, No 1, Feb 1997.

২৪. Choudhury Dilara and Hasanuzzaman Al Masud "Political decision making in Bangladesh and the role of Women"Asian Profile,vol 25,No 1,Feb 1997.

২৫. Choudhury Dilara and Hasanuzzaman Al Masud "Political decision making in Bangladesh and the role of Women"Asian Profile,vol 25,No 1,Feb 1997.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়: বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশে নারীর অবস্থান

নারীদশক, নারীবর্ষ ও বিশ্ব নারী সম্মেলন বিশ্বব্যাপী নারীদের সচেতনতা এবং অধিকার আদায়ে ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘের এসব উদ্যোগ বাংলাদেশের নারীদের উপর কি প্রভাব ফেলেছে তা মূল্যায়ন করাই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। এটি তিনটি অংশে আলোচনা করা হয়েছে: ১. জাতিসংঘ ও বিশ্ব নারী সম্মেলন ২. বিশ্ব নারী সম্মেলনরে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান, এবং ৩. নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ ।

৪.১ জাতিসংঘ ও বিশ্ব নারী সম্মেলন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারীর মুক্তি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। এই আন্দোলনের ফলে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের নারীরা জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছেন। ১৯৪৫ সালে নারী পুরুষের মধ্যে সমতার নীতিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন গঠিত হয়। (শাহীন,১৯৯৮)[১] ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে বলা হয়েছির যে, নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থায় নারীর ভোটদান ও নির্বাচনের অধিকার এবং সরকারি যে কোন দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে।(মালেকা বেগম,১৯৯০)[২] ১৯৬২ সালে জাতিসংঘ সাধারন পরিষদ বিবাহে সম্মতি, বিবাহের ন্যূনতম বয়সসীমা এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন অনুমোদন করে।

৪.২ মেক্সিকো সম্মেলন: (১৯৭৫)[৩]

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি - এই শ্লোগান ঘোষিত হয়। এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশ্ব পরিকল্পনা গৃহীত হয়। মেক্সিকো ঘোষণার প্রারম্ভে স্বীকার করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী নারীরা নির্যাতিত। এটি নির্যাতনকে অসমতা এবং অনুন্নয়নের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত করে নারীদেরকে যে কোন ধরণের সংহিসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানায়। (জাহানারা হক ১৯৯৭)[৩]

মেক্সিকো সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যার প্রধান কয়েকটি হলো:

ক. আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের (১৯৭৫) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব পরিকল্পনা অনুমোদন করে।

খ. ১৯৭৬ ৮৫ সময়কে জাতিসংঘের নারীদশক ঘোষণা করা

গ. নারীদশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. নারী বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা- যার নাম দেয়া হয় United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of women (INSTRAW)

৪.৩ সিডও (CEDAW) [৪]

সিডও সনদ হল নারীর অধিকারের আর্ন্তজাতিক বিল (International Bill of Rights)। নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ সনদ বা চুক্তি হচ্ছে সিডও (CEDAW) ,১৯৭৯ সালের ১৮ ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই সনদ বা কনভেনশন কিংবা দলিল প্রণয়ন ও গৃহীত হয়। ইংরেজীতে একে বলা হয়েছে Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women বা সংক্ষেপে সিডও (CEDAW)। বাংলায় বলা হয় নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ । সাধারনতঃ ইংরেজী থেকে সংক্ষেপ করে বলা হয় সিডও (CEDAW)।

ধারা নং - ৭ : নারীর রাজনৈতিক জীবনধারা ও অধিকার

শরীক রাষ্ট্রসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জন - জীবনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে বিশেষ করে, পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে, যে সব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে সেগুলো হচ্ছে :

(ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থাসমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া :

(খ) সরকারী নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন ;

(গ) দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থা ও সমিতিসমূহের কাজে অংশগ্রহন ।

৪.৪ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও এবং বাংলাদেশের আইন বিধান : একটি তুলনামূলক সমীক্ষার সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সিডও বা নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা । এর ৩০ ধারার ২ থেকে ১৬ ধারায় নারীর প্রতি বৈষম্য

Dhaka University Institutional Repository

বিলোপসহ নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল বর্ণিত হয়েছে । ১৭-৩০ ধারা কর্মপন্থা ও দায়দায়িত্ব এবং প্রশাসন সংক্রান্ত । মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের আরো অন্যান্য সনদ থাকলেও সিডও হলো নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম বৈশ্বিক দলিল ।

নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত সিডও সনদের ধারায় (ধারা ৭) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের সকল প্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়েছে । বাংলাদেশের সংবিধানে বৈষম্যহীনভাবে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ৬৬ (১), ভোটাধিকার প্রয়োগ ১২২ (১), নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ১২২(২) বিধান বিদ্যমান । ১৯৭৯ সালে ২য় জাতীয় সংসদে নারীদেরও সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০টিতে উন্নীত করে এর মেয়াদ ১৫ বছর বৃদ্ধি করা হয় । কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে এর ধারাবাহিক কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হয় । পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ৩০টি আসনের মেয়াদকাল আরো ১০ বছর বাড়ানোর পর সপ্তম সংসদই নারীদের সংরক্ষিত আসনের শেষ টার্ম । সরকার এক্ষেত্রে এই আসনের মেয়াদ আরো ১৫ বছর বৃদ্ধি করে সংসদে বিল পেশ করলেও, বাংলাদেশের নারী সমাজ কর্তৃক উত্থাপিত বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবিটি এখানে উপেক্ষিত হয়েছে । পরবর্তীতে বর্তমান সরকার সমগ্র নারীসমাজের দাবিকে আবারো উপেক্ষা করে সংসদে নারী আসনকে ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীত করে মনোনয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে। নারীদের স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । গ্রাম পরিষদ আইন ১৯৯৭ ধারা ৫(১), পৌরসভা অধ্যাদেশ আইন ১৯৯৮ ধারা (৬) (ক) (১), ধারা ৬ (গ) (৩), উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ ৬ (ঘ) - এই সমস্ত আইনে নারীদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করে সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছে । তবে রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে, নারীদেরকে নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান দলগুলির প্রচন্ড অনীহা এখনও প্রবলভাবে বিদ্যমান ।

৪.৫ কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০)[৫]

এই সম্মেলনে ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। সম্মেলনে নারীদশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোপেনহেগেন সম্মেলনের উপবিষয় (Sub-theme) ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান।

কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১) জাতিসংঘের নারীদশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথার্থ প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪) জাতিসংঘের নারীদশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫) পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

৬) নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা দেশগুলো যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭) জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিক্ষা প্রশিক্ষণে সমতা আনতে হবে।

৯) তথ্য, শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানের মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধারণ করার অধিকার দিতে হবে।

(জাহানারা হক ১৯৯৭)[৬]

৪.৬ নাইরোবি সম্মেলন (১৯৮৫)[৭]

জাতিসংঘ নারীদশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষ প্রান্তে তৃতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবিতে। এর উদ্দেশ্য ছিল নারী দশকের বিষয়বস্তু 'সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তি' কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা। এই সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবি অগ্রমুখীকৌশলসমূহ (The Nairobi forward-looking strategies for the advancement of women) গৃহীত হয়। এতে লিঙ্গীয় সমতা, নারীর ক্ষমতা, মজুরীবিহীন কাজের স্বীকৃতি, মজুরিযুক্ত কাজের অগ্রগতি, নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা, উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়।

উক্ত ঘোষণার বিভিন্ন অংশ রয়েছে, যেমন" নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলের পটভূমি; সমতা; উন্নয়ন ও শান্তি; বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা। বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন (১) খরায় আক্রান্ত নারী; (২) শহরের দরিদ্র নারী; (৩) বৃদ্ধ নারী; (৪) যুবতী নারী; (৫) অপমানিত (Abuse) নারী; (৬) দুঃস্থ নারী; (৭) পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী; (৮) জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী; (৯) পরিবারের একক উপার্জনশীল নারী; (১০) শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম নারী (১১) বিনা বিচারে আটক নারী; (১২) শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু; (১৩) অভিবাসী নারী; এবং (১৪) সংখ্যালঘু ও আদিবাসী নারী।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর অগ্রগতির পথে বাধাসমূহ দূর করার সুস্পষ্ট পদক্ষেপের কথা নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলে বর্ণিত আছে যার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৬-২০০০ সাল পর্যন্ত। এই দলিলটি তৈরি করা হয়েছে সমতা নীতির ভিত্তিতে যা সমর্থিত হয়েছে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা, মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে।

৪.৭ অন্যান্য জাতিসংঘ সম্মেলন

৯০এর দশকে বিশ্ব মনোযোগ ছিল আরোও অন্যান্য জাতিসংঘ সম্মেলনের দিকে যার মাধ্যমে বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান করা যায়। এসব সম্মেলনে নাগরিকদের অধিকারের বিষয়গুলো উঠে আসে। মাত্র চার বছরের মধ্যে জাতিসংঘ উন্নয়ন এজেন্ডা বিষয়ক চারটি সম্মেলনের আয়োজন করে।

১. ১৯৯২ সালে রিওডি জেনেরিয়োতে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন।

২. ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় মানবাধিকারের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন।

৩. ১৯৯৫ সালে কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তজার্তিক সম্মেলন।

৪. ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন।

যদিও পরিবেশ, মানবাধিকার, জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের মতো বিষয়গুলো পূর্বে নারী ইস্যু হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি তবুও এসব সম্মেলনে একটা ঐক্যমত তৈরি হয়েছে যে জেন্ডার ইস্যুটি সকল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এসব সম্মেলনে আন্তজার্তিক নারীর আন্দোলনকে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যায়। নারীরা সিভিল সমাজের নেত্রী হিসেবে বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে জেন্ডারকে একটি সার্বজনীন প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিবেশ, মানবাধিকার জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য এখণ আর জেন্ডার বর্হিভূত বিষয় নয়। অন্যদিকে নারী পুরুষের ভূমিকা, দায়িত্ব কর্তব্য ও সম্পর্কসহ জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলো আর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের বাইরের বিষয় নয়।

৪.৮ নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন: রিওডিজেনেরো (১৯৯২)[৮]

এ সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং তারা হচ্ছে সবচেয়ে দরিদ্র। সুতরাং ঘুর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুযোর্গের মত পরিবেশ বিপর্যয়ের সময় তারাই সবচেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভোগের শিকার হন। এই কারণেই নারীর জীবন খাদ্য, জ্বালানি, পানি, আশ্রয়সহ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তারা শুধু ভোক্তা হিসাবেই প্রকৃতির সাথে জড়িত নন, পরিবেশগত সম্পদের উৎপাদক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবেও সম্পর্কিত। সুতরাং উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা অথবা যে কোনো বিষয়ের জন্য কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন, পরিবেশ এবং নারী বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কিত। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

৪.৯ জাকার্তা ঘোষণা (১৯৯৪)

১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর অগ্রগতির জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়া। এই সম্মেলনের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতির উপর বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা গেছে ১৯৮৫ সাল থেকে নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হবার পর অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৪.১০ বেইজিং সম্মেলন ১৯৯৫

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন বেইজিং ঘোষণা প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত রুপ লাভ করে। জেন্ডার সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি এবং নারীর ক্ষমতায়ন এজেন্ডার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। এই ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের সরকার বিশ শতকের পূর্বে ১৯৮৫ সালে নায়রোবিতে যে সকল স্ট্রেটেজি গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এই প্লাটফর্মের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদসমূহকে গতিশীল করার প্রয়াস পায়। বেইজিং কনফারেন্সে প্রতিটা দেশই National plan of Action (NPA) উন্নয়নের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যেখানে নারীর দেশভিত্তিক পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট নীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

(ক) এক নজরে প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন

১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে বেইজিংয়ে যে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়, তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হল প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন বা PFA, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কাজের মঞ্চ । সম্মেলনের পরও ৩৮০ পৃষ্ঠার এই সুদীর্ঘ দলিলের গুরুত্ব একটুও কমেনি, কারণ ২০০৫ সাল পর্যন্ত এই দলিলের ভিত্তিতে বহু দেশের সরকার তাদের ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা ও নারী সংক্রান্ত নীতিগুলি নির্ধারণ করছেন এবং আরও করবেন ।

Dhaka University Institutional Repository

দলিলটির একটি মনে রাখার মতো দিক হল- এখানে নারীর প্রয়োজনের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে নারীর অধিকারের কথা । এমন বেশ কিছু সিদ্ধান্ত PFA- তে নেওয়া হয়েছে, যেগুলি নারী আন্দোলনকে সাহায্য করবে; আবার কিছু কিছু ফাঁকও থেকে গেছে। নিচে এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি তুলে ধরা হলো-

'নারীর অধিকার মানবাধিকার' এই দাবিটি স্বীকৃতি পেয়েছে

- CEDAW- তে সই করা রাষ্ট্রসংঘের সদস্য সমস্ত দেশের পক্ষে বাধ্যতামূলক
- নারী বিরোধী হিংসাকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও লোকাচারের দোহাই দিয়ে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করাও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
- নারী নির্যাতন রুখতে নানা কার্যক্রম চালু করা ও আইন বদলানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
- যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মেয়েদের ওপর যৌন অত্যাচার চলবেনা- ধর্ষণ যুদ্ধকালীন অপরাধ বলে গণ্য হবে
- নিজেদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকার পুরোপুরি মেয়েদের-গর্ভপাতের স্বাধীনতা থাকবে ; গর্ভপাত অপরাধ বলে গণ্য হবে না
- রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মেয়েদের সামিল করার জন্য সরকারী সহযোগিতা দরকার; সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
- শিশু কন্যার শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে

PFA-র অসুবিধার দিকগুলি

- মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার আলোচনা করা হয়েছে; শুধুমাত্র ছোটখাটো ব্যবসা ও ঋণের নিরিখে-দারিদ্র্যের কাঠামোগত কারণগুলি বিশ্লেষণ করা হয়নি

- অর্থনীতির বিশ্বায়নের কারণে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে; বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে অথচ এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার কোনও পথ PFA-তে দেখানো হয়নি

(গ) বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন বা পিএফএ (PFA)'র সামগ্রিক কাঠামো

ক. ঘোষনা বা মিশন স্টেটমেন্ট
খ. বৈশ্বিক কাঠামো

গ. গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়:

- নারী ও দারিদ্র্য

Dhaka University Institutional Repository

- নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- নারী ও স্বাস্থ্য
- নারী নির্যাতন
- নারী ও সশস্ত্র সংঘাত
- নারী ও অর্থনীতি
- ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী
- নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম
- নারীর মানবাধিকার
- নারী ও গণমাধ্যম
- নারী ও পরিবেশ
- মেয়ে শিশু

ঘ. কৌশলগত উদ্দেশ্য

উপরোল্লিখিত সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস

১.জাতীয় পর্যায়

২.আঞ্চলিক পর্যায়

৩.আন্তর্জাতিক পর্যায়

চ. আর্থিক বিন্যাস

সরকার প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নে কতখানি আন্তরিক তা পরিমাপ করার একটি উপায়।

(ঘ) বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন কেন গুরুত্বপূর্ণ :

জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন জড়িয়ে রয়েছে। সে জন্যই এই প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন প্রসঙ্গে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা যায় না । ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত কার্যক্রমগুলি যাতে বাস্তবায়িত হয় সে জন্য সর্বস্তরের নারীদের সচেষ্ট হতে হবে । কেননা প্রত্যেকের এক্ষেত্রে কিছু না কিছু করণীয় রয়েছে। যথা:-

- সন্তান যেন নি:শঙ্কচিত্তে, কোন প্রকার সম্ভ্রমহানী বা আক্রমণের শিকার হবার ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মাধ্যমিক স্কুলে পড়তে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- গ্রামীণ নারী হিসেবে সরকারের নীতিমালা বিষয়ক আলোচনার সময় নারীদের বক্তব্যও যেন সেখানে পৌঁছায়।

- গণমাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনের একজন সত্যিকার মানুষ রূপে নারীদেরকে আসতে হবে । গণমাধ্যমের নীতি নির্ধারণী অবস্থানে থাকতে হবে।

- কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনগত নিরাপত্তা প্রয়োজন।

৪.১১ বেইজিং+৫

২০০০ সালের জুন মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৩ তম পর্বে সরকার ও এনজিওদের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে BPFA I NPA-এ অধিকারের প্রতি সরকারী এবং এনজিও ও প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে সাধিত অগ্রগতির মূল্যায়ন করেন।

এইসব অঙ্গীকারগুলো পুনরায় বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতার প্রতি আলোকপাত করে এসকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার জন্য স্ট্রেটেজি গ্রহণ করে।

জাতিসংঘ সম্মেলনের বিশেষ ২৩ তম পর্বে যে সরকার প্রধানরা একত্রিত হয়েছিলেন তারা বেইজিং ঘোষণা ও প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশান-এ লিপিবদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি পুনরায় অঙ্গীকার করেন। সরকার অগ্রগতির পর্যালোচনা করে প্লাটফরম ফর অ্যাকসনের বাস্তবায়নের বাধা ও বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করেন। তারা লক্ষ্য করেন যে, প্লাটফরম ফর এ্যাকসনে যেসব লক্ষ্য ও অঙ্গীকার করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। তাই তারা স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করতে সম্মত হন। তারা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, জেন্ডার সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা হয়েছে।

৪.১২ বেইজিং+১০ (২০০৫)

জাতিসংঘ নারীপ্রগতি সংঘ আয়োজিত বেইজিং+১০ পর্যালোচনা ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে নারীর মর্যাদা বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন তার নিয়মিত সেশন হিসাবে বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকসনের (বি+১০) ১০ বছরের পর্যালোচনা করে। উপরোক্ত, সহস্রাব্দ ঘোষণা ও উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG's)-এর জাতিসংঘ পর্যালোচনা ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনাটি ছিল রিপোর্টিং কার্যক্রম যা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। এখানে সর্বোচ্চ অনুশীলন ও কার্যকরী পদক্ষেপের উপর জোড় দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ এটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করে এবং বাস্তবায়নের বাধাসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৩ নারীর অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উদ্যোগসমূহ

নারী উন্নয়নে জাতিসংঘ ভূমিকার কালপঞ্জি

- ১৯৪৫-নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক উদ্যোগ জাতিসংঘ সনদ গৃহীত
- ১৯৪৬-নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন (CSW) গঠিত
- ১৯৪৯-মানুষ পাচার দমন ও পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে শোষণ অবসানের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক সনদ অনুমোদন
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক একই গুরুত্বের কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের একই বেতন দান সম্পর্কিত সনদ অনুমোদন
- ১৯৫২- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত সনদ অনুমোদন। এই সনদে প্রথম বারের মতো নারীর ভোটাধিকারসহ আইনের অধীনে সমান রাজনৈতিক অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদন করা হয়।
- ১৯৫৭- স্বামীর কার্যক্রম নির্বিশেষে নারীর জাতীয়তা সংরক্ষণ বা পরিবর্তন করার অধিকার দিয়ে বিবাহিত নারীর জাতীয়তা সম্পর্কিত সনদ গৃহীত।
- ১৯৬০- কর্মসংস্থান ও পেশাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সম্পর্কিত ILO সনদ গৃহীত।
- ১৯৬২- সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিবাহ ক্ষেত্রে সম্মতি, বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও বিয়ের রেজিষ্ট্রীকরণ সম্পর্কিত সনদ অনুমোদন।

১৯৬৭ নারীর বিরুদ্ধে সব ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা অনুমোদন।

- ১৯৭২-নারীদের সমস্যার উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৫ কে আন্ত র্জাতিক নারী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা।
- ১৯৭৪-জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ উপলক্ষ্যে বিশ্ব সম্মেলন আহ্বান।
- ১৯৭৫-জাতিসংঘ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ পালন। মেক্সিকো সিটিতে ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ইয়ার ট্রিবিউন (IWYT) প্রথম বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করে এবং সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে প্রথম নারী দশক ঘোষণা করে।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৭৬-সাধারণ পরিষদ কর্তৃক জাতিসংঘ নারী দশকের জন্য স্বেচ্ছামূলক তহবিল এবং নারী প্রগতির জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রশিক্ষণ ও (INSTRAW) ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
- ১৯৭৯- সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নারীর বিরুদ্ধে সকল রকম বৈষম্য দুরীকরণ সম্পর্কিত সিডও (CEDAW) সনদ অনুমোদন।
- ১৯৮০- নারী প্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে চালু ।
- জাতিসংঘ নারী দশকের মাঝামাঝি ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নারী সম্মেলনে অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং নারী দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন।
- ১৯৮১- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ- সিডও এর কার্যক্রম চালু।
- ১৯৮৫- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ম্যান্ডেট অনুসারে সম্প্রসারিত জাতিসংঘ নারী দশক সম্পর্কিত স্বেচ্ছামূলক তহবিল জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন বা ইউনিফেম নামে জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ।
- নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারী প্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমূখী কৌশলসমূহ গৃহীত।
- ১৯৮৮- উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম বিশ্ব জরিপ অনুষ্ঠিত।
- ১৯৯০ -নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন কর্তৃক নাইরোবী অগ্রমূখী কৌশল বাস্তবায়ন পর্যালোচনা। চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন আহ্বানের সুপারিশ।
- ১৯৯১-নারীর অবস্থা সম্পর্কে উপাত্তের বা ডাটার একটি সংকলন " বিশ্বের নারী ঃ প্রবণতা ও পরিসংখ্যান" প্রকাশ করা হয়।
- ১৯৯২-জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি।
- ১৯৯৩- ভিয়েনা বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং নারীর অন্যান্য মানবাধিকারজনিত সমস্যাকে জাতিসংঘের সার্বিক মানবাধিকার কর্মসূচী ও কর্মকান্ডের সঙ্গে একীভূতকরণ।
- নারী নির্যাতন সংক্রান্ত একজন বিশেষ যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ।

Dhaka University Institutional Repository

- সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা অনুমোদন।
- ১৯৯৪- কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রথমবারের মত উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিতকরণ। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের জন্য আঞ্চলিক প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়াস্বরূপ ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, আফ্রিকা, জর্ডান ও সেনেগালে আঞ্চলিক বৈঠক সম্পন্ন।
- ১৯৯৫- সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের কর্মসূচীতে নারীদের সমস্যার পুরো বিষয় প্রতিফলিত। খসড়া ঘোষণায় পূর্ণ সমতা নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্তি।
- বেইজিং এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত এবং এ সম্মেলনে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যালোচনা ও বির্তক অনুষ্ঠিত এবং বৈশ্বিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে নারী উন্নয়নের একটি বিশ্ব রূপ রেখা স্বরূপ বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন গৃহীত।
- ২০০০- আমেরিকা নিউইয়র্ক সিটিতে বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এই সম্মেলনে PFA এর আলোকে অগ্রগতি যাচাই করা হয় এবং ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করা হয়।
- ২০০৫- আমেরিকার নিউইর্য়কে বেইজিং প্লাস টেন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলনে গৃহীত করণীয় সমূহের পরের পাঁচ বছরের বাস্তবায়ন পরিমাপ এবং এক্ষেত্রে মূল সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত করে তা মোকাবেলায় এবং উদ্ভূত নতুন জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত করণীয়গুলো নির্ধারণ করার ছিল মূল উদ্দেশ্য।

উৎস: ফোকাস অন উইমেন ইউএন ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনফরমেশন

৪.১৪ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান

বাংলাদেশের সংবিধানে ২৮(২) ধারায় বলা আছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে" ।(বাংলাদেশের সংবিধান)। বাংলাদেশ নারী বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে। সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলদেশ তাত্ত্বিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) বাংলাদেশ ২, ১৩(ক) ১৬.১ গ,ঢ) ধারা সংরক্ষণসহ ১৯৮৪ সালে স্বাক্ষর করে। বলা হয় ঐ ধারাগুলো মুসলিম আইনের পরিপন্থী।(মালেকা বেগম, পৃ -১১০)[১০] পরে ১৯৯৭ সালে ১৩ক এবং ১৬(১)(চ) ধারায় আপত্তি প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ সরকার। সিডও সনদের ১৩(ক) ধারাটি হচ্ছে- "জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, একই অধিকার, বিশেষ করে পারিবারিক কল্যাণের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"আর ১৬(১)(চ) ধারায় রয়েছে, "অভিভাবকত্ব, প্রতিপালন করা, ট্রাস্টিশীপ ও পোষ্য সন্তান গ্রহণ, অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে, যেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারণা বিরাজমান, একই অধিকার ও দায়িত্ব, সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।" জানা যায়, সিডও সনদের ২ এবং ১৬(১)(গ) ধারার উপর অবশিষ্ট আপত্তি বাংলাদেশ প্রত্যাহার করে নি।

কারণ এ ধারা দু'টিতে সম্মতি দেয়ার সঙ্গে বিদ্যমান কিছু আইন সংশোধন, পরিবর্তন ও বাতিলের প্রশ্ন জড়িত,(ভোরের কাগজ ১৯৯৭)[১১]। তবে প্রচলিত যে আইন আছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে নারী নির্যাতন অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হতো। কিন্তু সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশের নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

জন্মের পর থেকে নারী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। পিতার সংসারে কন্যাশিশু বোঝা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, অন্যদিকে পুত্রকে মনে করা হয় সংসারের সম্পদ। কারণ, রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে বৃদ্ধ বয়সে পুত্ররা পিতা-মাতাকে দেখাশোনা করবে তা ধরে নেয়া হয়,(চৌধুরী ১৯৯৭)[১২]। অন্যদিকে কন্যা শিশুকে বোঝা হিসাবে বিবেচনা করার আরেকটা প্রধান কারণ হচ্ছে যৌতুক প্রথা। দরকষাকষির পর যৌতুক দিতে স্বীকৃত না হলে বিয়ে সংগঠিত হয় না, আর স্বীকৃত হবার পর দিতে ব্যর্থ হলে মেয়ের উপর নানা অত্যাচার শুরু হয়। এই অত্যাচার দৈহিক বা মানসিক হতে পারে অথবা মানসিক অত্যাচারই ক্রমান্বয়ে দৈহিক অত্যাচারে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশে ১৯৯৮ সালে যৌতুক সম্পর্কিত সহিংসতার সংখ্যা ২৩৯ (সারণি-১)। অথচ বাংলাদেশে যৌতুক-বিরোধী আইন রয়েছে যা যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮০ নামে অন্তর্ভুক্ত,(নারী ও শিশু নির্যাতন আইন,১৯৯৫)[১৩]। দেখা গেছে যৌতুক প্রথা বাল্য বিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ। অল্প বয়স্ক মেয়ে হলে যৌতুকের পরিমাণ কম হয়। তাই দরিদ্র বাবা-মা অধিক পরিমাণ যৌতুকের ভয়ে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়,(ফারাহ দীবা,১৯৯৫)[১৪]। যদিও বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স (২০.০) বাড়ছে তবুও প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছর বয়সের আগে।[১৫] অথচ আইনগতভাবে বিয়ের জন্য মেয়েদের ন্যূনতম বয়স ১৮ হতে হবে। ১৮ বছরের নিচে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেয়া হলে তা বাল্যবিবাহ বলে গণ্য হবে এবং বাল্যবিবাহ পরিচালনা ও সম্পাদন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ,(রাবিয়া ১৯৮৬)[১৬]। নারীর শারীরিক সৌন্দর্যও যৌতুকের পরিমাণের উপর প্রভাব ফেলে। দেখা যায় মেয়ে সুন্দরী হলে যৌতুকের পরিমাণ কম হয়। তাই সন্তান জন্মলাভের পর যদি কোন কন্যাসন্তান শারীরিকভাবে সুন্দর না হয়, তবে তার পিতা-মাতা তাকে আরো বোঝা হিসেবে মনে করেন। কারণ, শারীরিকভাবে অসুন্দর মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় আর দরিদ্র পরিবারে এই সমস্যা আরো প্রকট

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে দেখা দেয়। পুরুষের জন্য নারীর সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা মুখ্য করে তোলার ক্ষেত্রে প্রচারমাধ্যমে যেমন- চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা অর্জন, স্বনির্ভরতা অর্জন বা ভাল মানুষ হওয়া নয়, নারী জীবনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সুন্দরী এবং লাবণ্যময়ী হওয়া- এই ধারণা চলচ্চিত্র, নাটক এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, শারীরিক সৌন্দর্যের অভাবে শিক্ষিত, স্বনির্ভর নারীরও বিয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমাদের সমাজ অবিবাহিত নারীকে সম্মান দেয় না। পিতা-মাতারা তাকে বোঝা হিসেবে মনে করতে শুরু করেন এবং বলা হয় এ ধরণের মেয়ে হচ্ছে গলায় আটকানো কাঁটার মতো (আশরাফুল ১৯৮৫)[১৭]।

বেইজিং ঘোষণায় বলা হয়েছে, শিক্ষা একটি মানবিক অধিকার এবং সমতা, উন্নয়ন ও প্রগতির লক্ষ্য অর্জনে এক অপরিহার্য হাতিয়ার। অধিকাংশ নারীকে যদি পরিবর্তনের বাহক হতে হয় তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা থাকা প্রয়োজন[১৮]। কিন্তু বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল পর্যায়ে লিঙ্গীয় অসমতা রয়েছে। বাংলাদেশে নারী স্বাক্ষরতা হার হচ্ছে মাত্র ৩৮.১%, যা পুরুষের ৫৫.৬%-এর তুলনায় অনেক কম। প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৬.৫৮% এবং মধ্যমিক পর্যায়ে ৪৩.৩৮% ছাত্রী পড়াশোনা করছে,(পরিসংখ্যান পকেট বই,১৯৯৭)[১৯]। ১৯৯৯ সালের এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মেধা তালিকায় মেয়েদের অবস্থান ছেলেদের তুলনায় অনুজ্জ্বল। শতকরা হিসাবে মেধা তালিকায় মেয়েদের উপস্থিতি ৩০- এরও নিচে(ভোরের কাগজ ১৯৯৯)[২০]। সরকারি কলেজে ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ৩২.৮২%, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩.৭০% ছাত্রী পড়াশোনা করছে। মেয়েদের শিক্ষার এই চিত্রটি বিশেষ করে উচ্চতর পর্যায়ে বেশ নৈরাশ্যজনক। যদিও আগের চাইতে শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতি হয়েছে, তথাপি এখানে আমাদের সমাজে মেয়েদের শিক্ষা দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো বিয়ে দেয়া।

নারীদের স্বাস্থ্যের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ নারী প্রসবকালীন জটিলতায় মারা যান। ইউনিসেফের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবছর প্রায় ৬,০০,০০০ জটিল ডেলিভারী কেসের মধ্যে ৯০% পরিচালিত হয় অপ্রশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে। প্রতি বছর প্রায় ৪ মিলিয়ন নারী সন্তান জন্ম দেন, এদের মাঝে ৬০% রক্তশূন্যতা এবং অপুষ্টিতে ভোগেন(ডেইলি স্টার ১৯৯৯)[২১]। ৫ বছরের নিচে ছেলেশিশুর তুলনায় মেয়েশিশুর ক্যালোরি গ্রহণের হার শতকরা ১৬ ভাগ কম। ৫-১৪ বছরের বয়সের ছেলের তুলনায় মেয়ে ১১ ভাগ কম এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শতকরা ২৯ ভাগ কম। পুরুষের আয়ুষ্কাল হচ্ছে ৫৯.১ বছর অন্যদিকে নারীদের ৫৮.৬ বছর। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৭। ১-৪ বছরের মধ্যে প্রতি হাজারে

Dhaka University Institutional Repository

ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার ১১.৪, অন্যদিকে মেয়েশিশুর মৃত্যুর হার ১১.৮ (পরিসংখ্যান বাৎস্যরিক বই ১৯৯৭)[২২]।

৪.১৫ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

কোনো আপত্তি ছাড়াই বাংলাদেশ সরকার বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত নারী উন্নয়নের বৈশ্বিক নীল নক্সা প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (PFA) অনুমোদন করেছে। এই প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছিল বেইজিং সম্মেলনে। সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ৮ মার্চ '৯৭ জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (NAP)'র খসড়া করেছে।

(১) প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন ও বাংলাদেশ

একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্লাটফরম ফর এ্যাকশনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে । এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার জন্য দুই বছরের বেশি সময় লেগেছে । এই সময়কালে ধারাবাহিকভাবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা এই খসড়া রচনা ও সংশোধন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে এবং অবদান রেখেছে। ফলে এতে নারীর জন্য সম-অধিকারের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বিশ্ব জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে যাতে করে 'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি' অর্জিত হয় । এটা নারীর জীবনের বিভিন্ন দিকের পরস্পর সংযুক্ততা এবং সর্বক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয় ।

নারীর গুরুত্ব যাতে করে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সব সিদ্ধান্তে সমভাবে অংশ নিতে পারে, ক্ষমতায়নের সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার মূল ভাবনাটি সমগ্র বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন জুড়ে সঞ্চারিত হয়েছে। এখানে নারীর অধিকার মানবাধিকার বলে স্বীকৃতিদান করে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার, প্রজনন অধিকার প্রভৃতি সকল বিষয়ে নারী অধিকার রয়েছে । আর এগুলো নারীর জন্য কোনো বাড়তি সুবিধা বা ছাড় নয়, বরঞ্চ মানুষ হিসেবে এগুলো তাদের মৌলিক অধিকার। প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের সবর্ত্রই এই দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

(২) প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসাধন পদ্ধতি (Institutional Mechanism)

বাংলাদেশ প্লাটফরম ফর অ্যাকশনের তদারকী (Follow-up) ও বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়কে শীর্ষ (Nodal) কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে । এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম বা কার্যসাধন পদ্ধতি চালু করেছে :

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভাপতি করে আন্ত:মন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে ।

বেইজিং সম্মেলনের ফলো-আপের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদফতর সরকারের বাইরের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের (Resource person) সমন্বয়ে একটি কোর গ্রুপ গঠন করেছে । এটি একটি ছোট ওয়ার্কিং গ্রুপ বিশেষ যা টাস্ক ফোর্সেরও স্বতন্ত্র বাহু (substantive arms) হিসেবে কাজ করবে এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Plan) প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত কাজের পরিকল্পনা ও তা সম্পাদনে মহিলা বিষয়ক অধিদফতরকে সহায়তা করবে ।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশনের ভিত্তিতে একটি ব্যাপকভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা করার জন্য একটি প্রক্রিয়া সূত্রায়িত (formulate) ও সূচনা করতে মন্ত্রণালয় এবং কোর গ্রুপ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে ।

(৩) সেক্টরভিত্তিক বা খাতওয়ারি চাহিদা নিরূপণ

জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action) প্রণয়নের প্রকৃত কাজের প্রস্তুতি হিসেবে নানা ধরনের কর্মতৎপরতা চালানোর জন্যে একটি আন্তঃখাত, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও ব্যাপকভিত্তিক অ্যাপ্রোচ (Broad based Aopproach) গ্রহণ করা হয় । কেননা নারীর অগ্রগতি গোটা সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়াস ও সিভিল সোসাইটির সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল অর্জিত হতে পারে।

প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (PFA) এ ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় বা ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে যার প্রত্যেকটির জন্য কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কার কি করণীয় তাও চিহ্নিত করা হয়েছে । এই ১২টি বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে নারী ও দারিদ্র্যতা, নারী ও অর্থনীতি, নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নারী ও স্বাস্থ্য, নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, নারী নির্যাতন, নারী ও পরিবেশ, নারী ও গণমাধ্যম,

Dhaka University Institutional Repository

নারীর মানবাধিকার, নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী এবং কন্যা শিশু । এই ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিত্তিতে ১২ টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করে দেখার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয়েছে । এই মন্ত্রণালয় বা বিভাগগুলো হচ্ছে:- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; শিল্প মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (LGRDC); স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয় ।

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় (Critical areas of concern) অপরিহার্য্যরূপে একাধিক মন্ত্রণালয়কে এর সাথে যুক্ত করে, আবার একই মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রকেও অন্তর্ভূক্ত করতে পারে । প্রয়োগের দায়-দায়িত্ব যেহেতু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ওপর বর্তাবে, পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটিও তাই ঐ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দ্বারাই সম্পাদনের প্রয়োজন হবে। প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন-এর সুপারিশসমূহের আলোকে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড ও পরিকল্পনা পর্যালোচনা করতে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য খাতওয়ারি চাহিদা নিরূপন টিমগুলো গঠন করা হয় । যাদের নিয়ে টিমগুলো গঠন করা হয় তারা হলো :-

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নের নারী বা উইভ ফোকাল পয়েন্ট

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা সম্পন্ন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক ।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে টিমগুলো কাজ শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালের মে মাসে রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরামর্শের কাজে সরকারের বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের মধ্যে রয়েছে নারী সংগঠনসমূহ, মানবাধিকার গ্রুপসমূহ, গবেষণা সংস্থা, প্রাইভেট সেক্টর, পেশাজীবী সংগঠন ইত্যাদি। খাতওয়ারী চাহিদা নিরূপণের এই প্রক্রিয়া নারী উন্নয়নে বাংলাদেশী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার ক্ষেত্রে সরকার ও সিভিল সোসাইটির অংশীদারিত্ব ভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় উদ্যোগকেই প্রতিফলিত করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার খসড়া

বিভিন্ন নারী সংগঠন , এনজিও এবং ফোরামের জন্য এনজিও প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক বেইজিং সম্মেলন-পূর্ব আলাপ-আলোচনা এবং সেক্টরাল রিভিউ -এর সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত সংশ্লেষণের ভিত্তিতে চূড়ান্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা খসড়া প্রণীত হয়েছে ।

জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনার ফলো-আপ ও মনিটরিং-এর সাথেও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ যুক্ত হবেন। এসবের মধ্যে থাকছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তাদের এজেন্সিসমূহ; পরিকল্পনা, অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মতো সার্ভিসিং (Servicing) মন্ত্রণালয়সমূহ; জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিগণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; উইভ ফোকাল পয়েন্টসমূহ, জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ ; নারী সংগঠনসমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ; আইন সহায়তাকারী সংগঠনসমূহ এবং এনজিওসমূহ ।

(৫) জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা সাংবিধানিক বিধানসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধান জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য সম-অধিকার প্রদান করেছে । সংবিধানের বেশ কটি ধারায় নারী অধিকার নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে । সংবিধানের ১০, ১৯(১) ও ২৮(২) ধারায় বলা হয়েছে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে ।

মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দুর করতে এবং সমগ্র প্রজাতন্ত্রব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি সমরূপ পর্যায় অর্জনের লক্ষ্যে নাগরিকদের মধ্যে সম্পদ ও সুযোগের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

'রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল পর্যায়ে পুরুষের মতো নারীর সম-অধিকার থাকবে'।

পার্লামেন্ট ও স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের ন্যায় রাজনৈতিক ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর ন্যূনতম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে কিছুসংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

(৬) সরকারী পরিকল্পনা ও অঙ্গীকার

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯১-৯৫) ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী উন্নয়ন নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে যাতে করে নারীকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা যায়। খাতওয়ারী পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে নারীর সমস্যাগুলো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য এই চতুর্থ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়নে নারী নীতিমালার কর্মকৌশলে বিভিন্ন খাতওয়ারী অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে ।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) ১৯৯৫-এর খসড়াতেও 'নারীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলধারায় টেনে আনা' র বিষয়টিকে সরকারের একটি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত খাতওয়ারী লিখিত বিবরণের গাইড লাইনে খাত/উপখাতওয়ারী উন্নয়নের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে নারীকে যুক্ত করার পদ্ধতি ও উপায়ের সুপারিশ সম্বলিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই পিএফএ-র মধ্যে সরকারের নীতি ও কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নের মূলধারায় কর্মকৌশলের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :

সরকার ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানসমূকে সকল নীতি ও কর্মসূচিতে জেন্ডার প্রেক্ষাপটকে মূলধারায় পরিণত করার একটি কার্যকর ও দৃশ্যমান নীতির প্রসার ঘটাতে হবে যাতে করে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের আগেই যথাক্রমে নারী ও পুরুষের ওপর সেগুলোর প্রভাব সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ প্রণয়ন করা যায় ।(প্যারা ২০২)

উপরের বিবৃতিটি নারী উন্নয়নের লক্ষ্যেই শুধু নয়, বরঞ্চ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের দায়-দায়িত্বের একটি সামগ্রিক অংশ হিসেবে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারকে সামনে তুলে ধরে । সরকারের সব কটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থারই নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে, কেননা দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হচ্ছে নারী যাদের সেবা করার জন্যই এই সংস্থাগুলো রয়েছে।

(৭) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার দর্শন

বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমগ্র জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনাকে যে দর্শন দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তা এমন এক সমাজ নির্মাণ করতে চায় যা :

- একটি মৌলিক ধারণা হিসেবে নারী ও পুরুষের মধ্যে সুযোগের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সমতা এবং সেই সঙ্গে ফল লাভের ক্ষেত্রেও সমতা প্রদান করে ।

Dhaka University Institutional Repository

- নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে এবং নারী ও পুরুষের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে ।
- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণকে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।
- কর্মক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে সংসারে নারী-পুরুষের মধ্যে কাজ ও অভিজ্ঞতার অধিকতর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করে ।
- নারীকে পরিবর্তন ও উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য করে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে নারীর পরিপূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণের জন্য বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টি করে ।
- সকল ক্ষেত্রে নারীর কাজ ও অবদানের মূল্য দেয় ।

৮) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার লক্ষ্য

সকল ক্ষেত্রে নারীর বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবদান এবং কর্মসূচি, সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যের কথা বিবেচনা করে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ স্থির করা হয়েছে :

ক. নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা ।

খ. পরিবার, সম্প্রদায় ও বৃহত্তর জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান ভূমিকাসহ নারীকে উন্নয়নের সমান অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা ।

গ. নীতিমালা সংস্কার ও দৃঢ় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আইনগত, অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক বাধাসমূহ অপসারণ করা যা সম-অধিকার চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ।

ঘ. নারীর স্বতন্ত্র চাহিদা, স্বার্থ ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং নারীর অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে অঙ্গীকার বৃদ্ধি করা ।

(৯) বাংলাদেশ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

- জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা

Dhaka University Institutional Repository

- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা
- নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য দুর করা
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা
- নারীর স্বার্থের অনুকূলে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ-বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা
- নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা
- নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ণ ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা
- বিশেষ দূর্দশাগ্রস্ত নারীর চাহিদা পুরণের ব্যবস্থা করা
- বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক ভাবমুর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেয়া
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা

(১০) জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কৌশল

সরকারি নীতি ও কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের কৌশলের ওপর এই পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হচ্ছে এই যে, নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল খাতওয়ারী মন্ত্রণালয় ও সরকারী এজেন্সির দায়-দায়িত্ব রয়েছে, কেননা দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশই হচ্ছে নারী যাদের সেবা করার জন্যই এসব সংস্থার জন্ম হয়েছে। যেসব প্রধাণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা এই পরিকল্পনার আওতাভূক্ত সেগুলো হচ্ছে : কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গন শিক্ষা অধিদপ্তর ; শিক্ষা; পরিবেশ ও বন; মৎস্য ও পশুপালন ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; স্বরাষ্ট্র ; তথ্য; শিল্প; শ্রম; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাকে জাতীয় মেশিনারি হিসেবে গণ্য করা যায় যা সকল নীতি-নির্ধারণী ক্ষেত্রে একটি জেন্ডার সমতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করার কাজে একটি সহায়ক সংগঠনের মতো সরকারকে সহায়তা করে। এর ভূমিকা প্রধাণতঃ অ্যাডভোকেসি, যোগাযোগ, সমন্বয় ও বাস্তবায়নের মনিটরিং -এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত। জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সেই সঙ্গে নারী উন্নয়নের জাতীয় মেশিনারির অন্যান্য উপাদান যেমন- জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ ও উন্নয়নে নারী বা উইড ফোকাল পয়েন্টসমূহের শক্তি বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে ।

ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার একটি ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট সক্রিয় কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে । নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনে একটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলোকে একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে ।

বিভিন্ন সরকারী মেশিনারিজ, স্থানীয় সরকার, সংস্থাসমূহ, এনজিও, নারী সংগঠন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা প্রভৃতিসহ উন্নয়নের সকল অংশীদারের মধ্যে নারী উন্নয়নের জন্য বন্টিত দায়িত্বটির ওপর এই জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় অধিকমাত্রায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ।

নারী উন্নয়নের অধিকাংশ ইস্যুর জন্যই যেহেতু বিভিন্ন খাতমূখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তাই জাতীয় কর্মপরিকল্পায় আন্তঃখাতভিত্তিক সংযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ।

সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে যেখানে আরো বরাদ্দের প্রয়োজন সেখানে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে । কেবলমাত্র কতগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়তি ও টেকনিক্যাল সম্পদের প্রয়োজন হবে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে । বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তাকে সকল খাতওয়ারি পরিকল্পনায় নারী কর্মী ও কর্মসূচির জন্য আলাদা বাজেট প্রণয়নের সাধারণ করণীয় হিসেবে জোর দেয়া হয়েছে ।

নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসাধন পদ্ধতি, দক্ষতা ও যোগ্যতা, কর্মসূচি, গবেষণা, সংযোগ ও মনিটরিং-এই ক'টি প্রধাণ দিকের প্রতি মূলতঃ জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় মনোযোগ স্থাপন হয়েছে ।

(১১) নীতিমালা প্রণয়ন / সংশোধন এবং নারী ইস্যু সংযুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এমন কোন সামগ্রিক নীতিমালা নেই যাতে করে এই খাতগুলো আসলে কি অর্জন করতে চায়, তাদের অগ্রাধিকারসমূহ, কর্মকৌশল অথবা কার্যক্রম কি তা বোঝা যায় । অবশ্য কয়েকটি খাতওয়ারী নীতিমালা প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। অন্যদের কিছু অনুমোদিত নীতিমালা থাকলেও নারী উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের কোন সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক ব্যাখ্যা বা উদ্দেশ্য নেই ।

পূর্ণাঙ্গ, সমন্বিত ও টেকসই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলে জাতীয় স্বারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় খাতওয়ারী নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকরী করা অথবা বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে যা কিনা নারীর স্বার্থ, চাহিদা ও অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনায় নিয়ে তাদের জন্য সমদর্শী ও সমতাধর্মী পদক্ষেপসমূহকে সমন্বিত ও সংযুক্ত করবে । ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের রূপরেখা অনুযায়ী নারী নির্যাতন সম্পর্কে এটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে । এছাড়াও জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা কতগুলো পেশা যেমন চিকিৎসা, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব যাদের নারী ও তাদের অধিকার সম্পর্কে আরো বেশি শ্রদ্ধাবোধ থাকা দরকার তাদের জন্য এবং এসব ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পরিবীক্ষণের জন্য পেশাগত দক্ষতার ভিত্তিতে প্রণীত জেন্ডার সংবেদশীল আচরণবিধি, নৈতিক বিধান ও স্ব-নিয়ন্ত্রন মেকানিজম গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছে ।

নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তাদের সংস্থাগুলোর সকল স্টাফের মধ্যে নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করার জন্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধিসহ প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে ভবিষ্যতে একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায়। খাতওয়ারী পরিকল্পনাগুলো যে নারীর চাহিদা, স্বার্থ ও বিষয়সমূহ সকল খাতভিত্তিক নীতিমালায় সংযুক্ত করেছে তা নিশ্চিত করা এবং এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাও এই জাতীয় পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে ।

(১২) ম্যান্ডেটের সংশোধন

খাতওয়ারী মন্ত্রণালয় ও তাদের সংস্থাগুলোর ম্যান্ডেটে যেহেতু নারী উন্নয়নে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই, তাই এই জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে নারীর অগ্রগতি ও উন্নয়নকে আরো এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রনালয় ও তাদের সংস্থাসমূহের ভূমিকাকে পরিষ্কারভাবে স্বীকৃতি দিতে মন্ত্রণালয় সংস্থাসমূহের বর্তমান কর্ম বরাদ্দ অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা এখনও সরকারের মধ্যে একটি প্রভাব ও উদ্বুদ্ধকারীরূপে জাতীয় ফোকাল পয়েন্টকে গড়ে তোলার যে বিশেষ অঙ্গীকার প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশান এ ঘোষিত হয়েছে তা প্রতিফলিত করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্ম বরাদ্দ সংশোধন করা হয়নি । সে জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি মিশন স্টেটমেন্ট প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী তার কর্মবরাদ্দ সংশোধন করবে। এই সংশোধিত ম্যান্ডেট সম্বন্ধে খাতওয়ারী মন্ত্রণালয়ের সকল স্টাফদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীর আরো অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের দায়-দায়িত্বের উপরও জোর দেয়া হয়েছে ।

(১৩) নীতি নির্ধারণী কাঠামোয় নারীর প্রতিনিধিত্ব

নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় গভর্নিং বোর্ড, নির্বাহী কমিটি, স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং খাতওয়ারী মন্ত্রণালয়সমূহ ও তাদের সংস্থাসমূহের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির মত সকল নীতি-নির্ধারণী কাঠামোতে পর্যাপ্ত নারী প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থায় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারী সদস্যদের কার্যকর ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় নারী সদস্যদের তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং সংগঠনের উদ্দেশ্যে ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিশেষ ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে ।

(১৪) সকল পর্যায়ে মহিলা কর্মকর্তাদের সংখ্যা/ অনুপাত বৃদ্ধি

সকল পর্যায়ে মহিলা স্টাফদের কম অনুপাতের বিষয়টি বিবেচনা করে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় প্রাথমিক, মধ্যস্তর এবং বিশেষ করে উচ্চতর ব্যবস্থাপক অবস্থানে বর্ধিক সংখ্যা ও অনুপাতে নারীর নিয়োগ ও পদোন্নতির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । সরকারী চাকুরিজীবীদের মধ্য থেকে উচ্চ পর্যায়ে সরাসরি নিযুক্তি (Lateral entry) এবং বাইরে থেকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিধান চালু করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহিলা ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা ভূমিকা ও সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় ।

(১৫) নারীর কর্মপরিবেশের উন্নতি সাধন

পেশাগত দায়িত্ব আরো ভালোভাবে সম্পাদন করায় নারীদের সক্ষম করে তুলতে তাদের কর্মপরিবেশের উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় তুলে ধরা হয়েছে । এই উন্নত কর্ম পরিবেশের মধ্যে রয়েছে প্রবেশন পিরিয়ডকালীন ছুটিসহ প্রসূতিকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা,

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান পালনকারী প্রতিষ্ঠান ও দিবাযত্ন কেন্দ্র (day care centre) স্থাপন, পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক টয়লেট সুবিধা , ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা বিশেষ করে নৈশকালীন কাজের জন্য এবং কর্মস্থলের বাইরে ট্যুরের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা ।

(১৬) উইড (WID) ফোকাল পয়েন্টের সামর্থ্য বৃদ্ধি

কার্যকর ও সমন্বিত প্রচেষ্টা নিশ্চিত করতে জাতীয় মেশিনারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উইড ফোকাল পয়েন্টসমূহের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে । নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্টসমূহের অবস্থানের উন্নয়ন, তাদের কর্ম দায়িত্বের মধ্যে উইড ফোকাল পয়েন্টরূপে তাদের দায়-দায়িত্বের সংযুক্তি, খাতওয়ারী মন্ত্রণালয়সমূহের আওতাধীন সকল সংস্থায় সাব উইড ফোকাল পয়েন্টের নিয়োগ / মনোনয়ন, সকল প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিতে তাদের সদস্যপদ নিশ্চিত করা, উইড ফোকাল পয়েন্টের প্রশিক্ষণ, স্টাফ সহায়তা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং আন্তঃ ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় মেকানিজম প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এই উইড ফোকাল পয়েন্ট শক্তিশালী করার প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

(১৭) স্টাফ ও উপকারভোগী সদস্যদের জেন্ডার প্রশিক্ষণ

জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার এগুলো সম্পর্কে নারী-পুরুষসহ সকল স্তরের স্টাফদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে তা কর্মসূচি ও প্রকল্পের মধ্যে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছে। অভ্যন্তরীন জেন্ডার সমন্বয়ক টিম গঠন এবং খাতওয়ারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনের প্রশিক্ষণ কারিক্যুলামে জেন্ডার প্রশিক্ষণের সংযুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এখানে। উপকারভোগী গ্রুপ সদস্যদের জন্য জেন্ডার প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে ঐসব গ্রুপের সঙ্গে কর্মরত খাতওয়ারী মন্ত্রণালয়সমূহের জন্য।

(১৮) মহিলা ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

প্রয়োজনীয়তার উপর জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনায় জোর দেয়া হয়েছে । ব্যবস্থাপক পদে নারীদের সংখ্যা ও অনুপাত বাড়ানোর একটি উপায় স্বরূপ এই উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে । এর পিছনে মূল যুক্তিটি হচ্ছে এই যে মহিলা ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের ফলে ভালোভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন হবে এবং তা বেশি সংখ্যক মহিলা নিয়োগ করতে উৎসাহ যোগাবে সংস্থাগুলোকে ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৯) পরিবীক্ষণ ছকে জেন্ডার নির্দিষ্ট নির্দেশক এবং নারী-পুরুষের বিভাজিত উপাত্ত সংযুক্তিকরণ

জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় খাতওয়ারী মন্ত্রণালয়গুলোর পরিবীক্ষণ মেকানিজমের উন্নয়ন সাধন ও শক্তি বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বিশেষ করে নারী-পুরুষের ওপর কর্মসূচি ও প্রকল্পের প্রভাব নিরূপন, নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেন্ডার নির্দিষ্ট নির্দেশক ও নারী-পুরুষের বিভাজিত উপাত্ত সংযুক্তকরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় একগুচ্ছ কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে আছে নির্দেশক (Indicator) নিরূপণ, পদ্ধতি ও ছকসমূহ সহজ করা, কর্মী প্রশিক্ষণ, নারীর অংশগ্রহণ সহযোগে অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলা, মাঠ পর্যায়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে তথ্যের ফিডব্যাক ।

(২০) সংযোগ ও সমন্বয়

একটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ উপায়ে নারী উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা ও ইস্যুসমূহ বিধৃত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় শুধুমাত্র আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্যই নয় বরং এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা, নারী সংগঠন, আইন সহায়তা সংস্থাসমূহ, বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী সমিতি, ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত এবং স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের সঙ্গে সংযোগ ও সমন্বয় স্থাপনের জন্যও প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম গড়ে তোলার প্রয়োজনীতার উপর খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ।

(২১) পরিকল্পনা প্রক্রিয়া, ফরমেট ও চেকলিস্ট সংশোধন

জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় একটি অধিকতর অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকল্প ফরম্যাট ও চেকলিস্ট সংশোধন ও উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে সকল প্রকল্প দলিলে নারীর চাহিদা, স্বার্থ ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটে ।

জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় যেসব খাতওয়ারী মন্ত্রণালয়ের তৃণমূল সংগঠনসমূহের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধা ভোগকারীদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ আছে তাদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় কতগুলো করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে । যেমন নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা, এন্টারপ্রেনারশীপ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, মার্কেটিং, অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রামসহ তথ্য ও যোগাযোগ সুযোগ প্রাপ্তি ।

(২২) গবেষণা

জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় খাতওয়ারী মন্ত্রণালয়সমূহের গবেষণা সংস্থা এবং বাইরের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা সম্পাদিত বিদ্যমান গবেষণা কাজের পর্যালোচনা এবং নারী উন্নয়নের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

অংশীদারদের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা চাহিদা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

৪.১৬ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সংশোধন

প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের সমস্যা

সম্প্রতি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি নতুন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেছে। গত ৮ মার্চ ২০০৮ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮-এর ঘোষণা দেন। এর ফলে দেশে মানবাধিকার ও নারী অধিকার নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি পূরণ হলো। এজন্য সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলসহ সংশ্লিষ্ট যারা এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সবাইকে আমরা অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে সরকার ১৯৯৭ সালে প্রথম একটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করে এবং পরবর্তীতে উক্ত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়। এই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নারী ও মানবাধিকার সংগঠন এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সুপারিশ ও মতামত নেয়া হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার কাছেই এই নীতিমালাটি গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়। মূলত বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (পিএফএ) ১৯৯৫-এর আলোকে প্রণীত এই নীতিমালা নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিক-নির্দেশক হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালে আরেক সরকারের আমলে নারী উন্নয়ন নীতিতে বেশকিছু সংশোধনী ও পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সম অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব খর্ব হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৪-এ নারীর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সমঅধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে নারীর নিয়োগ ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা-উপধারায় পরিবর্তন আনা বা বাদ দেয়ার কারণে নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে এবং এই পরিবর্তন ও সংশোধন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার মূল লক্ষ্যে পরিপন্থী- এই বিবেচনায় নারী অধিকার সংগঠনগুলো সে সময় এই নীতিমালার বিরোধিতা করেছিলো। ১৯৯৭ সালের নীতিমালা পুনর্বহালের দাবিতে তারা দীর্ঘদিন ধরে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন-সংগ্রামও করেছে। বছর খানেক আগে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে নারী উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি এবং তা বাস্তবায়নে ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের প্রথম দিকে এ সরকার নারী

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন নীতিমালার মূল লক্ষ্যের আলোকে পর্যালোচনা করে সুপারিশ দেয়ার জন্য নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে এসে আমরা এই নীতিমালাটি হাতে পেয়েছি।

ইতিবাচক উদ্যোগ: নারী উন্নয়ন নীতির প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে এতে ১৯৯৭ সালের নীতিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহের কিছু কিছু সময়ানুগ এবং যথোপযুক্ত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, ২০০৪ সালের সংশোধনীর যে বিষয়গুলোতে নারী ও অধিকার সংগঠনগুলো আপত্তি জানিয়েছিলো সেগুলো বাদ দেয়া হয়েছে এবং নতুন কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এই নীতিমালায় দরিদ্র নারীদের উন্নয়নের দিক নির্দেশনা সম্বলিত একটি নতুন উপধারা (ধারা ৯-এ) সংযোজন করা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে নারীর দারিদ্র্য নিরসনে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখবে। এটি বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের 'নারী ও দারিদ্র' সংক্রান্ত রূপরেখার সঙ্গে এবং পিআরএসপি-র (National Strategy for Accelerated Poverty Reduction) মূল স্পিরিটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নীতিমালায় নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের স্বীকৃতি প্রদান এবং বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে। সংসদে নারীর জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে (ধারা ১০.৫), যা নারী সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাকে পূরণ করেছে। সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীর সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে, যা নারীর অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার পথ সুগম করেছে। এটি বেইজিং পিএফএ-র 'নারী ও অর্থনীতি' শীর্ষক রূপরেখার অনুরূপ। প্রশাসনসহ বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের পদে এবং নীতিনির্ধারণী পদে নারীর নিয়োগ, বিদেশে শ্রমবাজারে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ (ধারা ৯.১৪.৭), কর্মজীবী নারীর শিশু যত্নের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন ছুটি পাঁচ মাস করা (ধারা ১২.১০) ইত্যাদি নতুন পদক্ষেপ কর্মক্ষেত্রে নারীর বর্ধিতহারে অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। এগুলো নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও নসদের ধারা ৪,৭ এবং ১১-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়াও নীতিমালার বিভিন্ন ধারায় প্রতিবন্ধী নারীদের সহায়তা দান, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে এবং জেন্ডার ইস্যুকে একটি ক্রস কাটিং ইস্যু হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা সামগ্রিক বিচারে নারীর জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু চ্যালেঞ্জঃ ১৯৯৭ সালের নীতিমালার ৭.২নং ধারায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির উপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হলেও ২০০৮-এর নীতিতে 'পূর্ণ সুযোগ' এবং 'উত্তরাধিকার' ও 'ভূমির উপর অধিকার' শব্দগুলো তুলে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০০৪-এর নীতিতে এ তিনটি শব্দের সঙ্গে 'সম্পদ' শব্দটিও বাদ দেয়া হয়েছিলো। অর্থাৎ এখন সম্পদে নারীর সমান সুযোগের বিষয়টি পুনর্বহাল করা হলেও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পদে পূর্ণ বা সমান সুযোগ এবং ভূমির উপর নারীর অধিকারের বিষয়টি আড়ালে চাপা পড়ে গেলো। ১৯৯৭-এর নীতিমালার ধারা-৮ এ বলা হয়েছে 'রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে।' ২০০৪ সালের প্রস্তাবিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার খসড়ায় এটি বাদ দেয়া হয়েছিলো এবং এবারের নীতিমালায়ও এটি রাখা হয়নি। ফলে এক্ষেত্রে বেসরকারি ও নারী সংগঠনসমূহের ভূমিকা খর্ব হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এছাড়া নীতিমালাটি বাস্তবায়ন কৌশলের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনসমূহের মধ্যে যে সহযোগিতার (১৯৯৭, ৭নং ধারা) কথা উল্লেখ করা হয়েছিলো, বর্তমান নীতিতে সেই ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে এবং অন্য ধারায় এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে নারী উন্নয়ন নীতিমালায় যেসব ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে তার সবকিছু যে খুব সহজেই বাস্তবায়ন করা যাবে তা বলা যায় না। যেমন নীতিমালার ১১ ধারায় নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা পূরণ করে সরকার ও প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কোটার ধারে-কাছেও এখনো পৌঁছানো যায়নি। ফলে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগই চলে যায় পুরুষদের কাছে। তেমনি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় ৬০% নারী কোটার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এসব কারণে নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো অনেকদূর পথ পাড়ি দিতে হবে। নীতিমালায় সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার এবং ব্যবসায় নারীর সমান অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নারীর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করলেই বাস্তবতাটি বোঝা যাবে। সম্পদে নারীর অধিকারের বিষয়টিই ধরা যাক। নীতিমালায় সম্পদে সমান সুযোগের কথা বলা হলেও উত্তরাধিকারের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মুসলিম নারীরা উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পায়, পক্ষান্তরে হিন্দু নারীরা প্রায় কিছুই পায় না। সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের কথা বলা হলেও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়গুলোয় নিষ্পত্তি হয় স্ব স্ব ধর্মভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

আইন দ্বারা, যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ এসব আইন যতোদিন পর্যন্ত পরিবর্তন বা সংস্কার করা না যাবে ততোদিন পর্যন্ত সম্পদে ও উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমতা বা সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, এই বিষয়টি সিডও সনদের যে ধারায় (ধারা ২) উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ তাতে দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ আরোপ করে রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে নারী অধিকার সংগঠনগুলোর অব্যাহত দাবি সত্ত্বেও কোনো সরকারই এ সংরক্ষণ বিলোপের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয়নি। সুতরাং এই অনির্বাচিত সরকারও যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার মতো বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিতে পারবে তা আশা করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা

১. রহমান ,শাহিন,জেন্ডার প্রসঙ্গ,স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট,১৯৯৮,পৃ-১৫

২. বেগম ,মালেকা, "নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ", নারী: রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুবাইয়া বেগম, সম্পাদিত, সমাজ নীরিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.১০০।

৩. Huq ,Jahanara et.al. Heijing Process and Follow-up, Bangladesh Perspective. Women for Women, 1997, p. 14-16.

৪. জাতিসংঘ:নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ,ইউনিসেফ।

৫. Huq ,Jahanara et.al. , প্রাগুক্ত. p. 14-16.

৬. প্রাগুক্ত.১৪-১৬

৭. The Nairobi Forward- Looking Strategies for the Advancement of Women, United Nations, 1985.

৮. প্রাগুক্ত.পৃ-২৩

৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

১০. বেগম ,মালেকা, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০।

১১. ভোরের কাগজ, ২০ জুলাই, ১৯৯৭।

১২. Chowdhury, Najma. "Bangladesh: GEnder Issues and Politics in a Patriarchy". Women and Politics: Worldwide ed., Barbara Nelson & Najma Chowdhury, Oxford University Press, 1997, p.94.

১৩. নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫।

১৪. চৌধুরী ,ফারাহ দীবা, বাল্য বিবাহের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, গ্রামীণ ট্রাস্ট, ১৯৯৫, পৃ.৮।

১৫. The Fifth Five Plan, 1997-2002. Planning Commission, Minsitry of Planing, Bangladesh, 1998, p. 176.

১৬. ভূইয়া ,রাবিয়া, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ মুসলিম নারীর আইনগত অধিকার, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৮৬, পৃ.১।

১৭. Aziz ,K.M. Ashraful and Clarence Maloney, Life Stages, Gender and Fertility in Bangladesh, ICDDRB, 1985, pp. 55-56.

১৮. জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন,বেইজিং,ঘোষনা ও কর্মপরিকল্পনা,রাজকয়ি ডেনমার্ক দূতাবাস,ঢাকা,১৯৯৭,পৃ.৫১

১৯. Statistical Yearbook of Bangladesh, 1997.

২০. ভোরের কাগজ, জুন ১৮, ১৯৯৯।

২১. The Daily Star, May, 24, 1999.

২২. Statistical Yearbook of Bangladesh, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন ও সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ক পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সাধারন আসন ও সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ক পর্যালোচনা

৫.১ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিককে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনে সমান অধিকার দান করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, জাতীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী পদে নির্বাচিত হওয়ার সমান অধিকার প্রত্যেক নারী-পুরুষের আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসব পদে নারীর অংশগ্রহণ নগণ্য। বস্তুত বাংলাদেশে নারী রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন। নানা কারণে নারী রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত এবং পুরুষের তুলনায় বৈষম্যের শিকার। এর প্রধান কারণ পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। যে কারণে আমাদের দেশে দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর একটানা সরকার প্রধান হিসেবে দুইজন নারী পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করলেও নারীর কল্যাণে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কাজ করতে হয়, সেটি পুরুষপ্রধান এবং পুরুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস অথচ রাজনৈতিক দলগুলো সনাতন পুরুষসুলভ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এটা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সরাসরি নিরুৎসাহিত না করলেও উৎসাহিত করে না।

449622

১৯৭২ সনে প্রণীত সংবিধান জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংবিধান প্রবর্তনের সময় থেকে ১০ বৎসরের জন্য সংরক্ষিত রাখে। ১৯৭৮ সনে সংশোধনীর মাধ্যমে এ সংখ্যা যথাক্রমে ৩০ ও ১৫-তে বর্ধিত করা হয়। ১৯৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংসদ ভেঙ্গে দিলে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত আসন প্রথাও অবলুপ্ত হয়। এ সময় ও পরবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে কিছু নারী সংগঠন সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা পূর্ণবহাল করার দাবী জানায়, বিশেষভাবে দুটি মাত্রা সংযোজন করেঃ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন। ১৯৮৮ সনে জাতীয় সংসদ দশম সংশোধনীর মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে ১০ বৎসরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেন। (সাংবিধানিক আইন,১৯৯০)নির্বাচন পদ্ধতি অপরিবর্তিত রয়ে যায়। অবশ্য, এরশাদ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত আসনের মনোনয়ন-নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর আরোপিত চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে ১৯৯১ সনে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্বাবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া আসনগুলিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে। এছাড়া সাধারণ আসনের তুলনায় সংরক্ষিত আসনগুলি গড়ে প্রায় দশগুণ বড় এলাকা নিয়ে গঠিত, কেননা এ আসগুলির জন্য প্রতিনিধিত্বের এলাকা নির্ধারণ করা হয় দেশকে ৩০টি নির্বাচনী জোন-এ ভাগ করে। রাজনৈতিক গুরুত্ব ও ক্ষমতার ভর সাধারণ আসনেই নিহিত থাকার কথা মূলতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ সরাসরি ও তৃণমূলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবার যে রাজনৈতিক শক্তি দলে, সংসদে ও নির্বাচনী এলাকায়, উপরিকাঠামোয় পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন সেই তুলনায় শক্তি যোগায় না। দ্বিতীয়তঃ সংরক্ষিত আসনের জন্য গঠিত নির্বাচনী এলাকা সাধারণ আসনের নির্বাচনী এলাকা থেকে দশগুণ বড় হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মহিলা সাংসদের জন্য তাঁর এলাকায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা আইনসভা ও জনগণের মধ্যে সংযোগের মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়, যতটুকু, তত্ত্বগতভাবে, সাধারণ আসনে নির্বাচিত সাংসদের জন্য সম্ভব।

১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সনে সংসদের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল তাদের দলীয় মহিলা রাজনীতিকদের সংরক্ষিত আসনে স্থান দেন, যদিও এদের মধ্যে দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও ছিলেন। আশির দশকের গোড়ায় দুজন মহিলা খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা, যথাক্রমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর নির্বাচনী ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো তাঁরা কেউই সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে সংসদে আসেন নি। ১৯৮৬ সনে শেখ হাসিনা মোট ৪টি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। (বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সেই নির্বাচন বর্জন করে) ১৯৯১ সনে খালেদা জিয়া ৫টি এবং শেখ হাসিনা ৩টি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নের্তৃত্ব ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব যে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সাধারণ আসনে প্রোথিত, এটা তা-ই প্রমান করে।

৫.২ সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী: আন্তজার্তিক প্রেক্ষিত

সংখ্যালঘুদের জন্য কোটা ও সংরক্ষিত আসন খুব সাধারণ বিষয় এবং নারীরা এই গোষ্ঠীর অন্যতম। Women are a 'political' minority rather than a numerical monority (Lijphart, ১৯৯৯,২৮০)।[১] যখন নারী কোটার মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা পায়, তার অর্থ এই নয় যে, তারা নীতি নির্ধারণী বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি হিসাবে মাঝে মাঝে তারা নারীদের জন্য কতক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। এসব নারীদের দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকা উচিত । যদি তারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পায় তবে তারা আইনসভার দক্ষ সদস্য হয়ে উঠতে পারে। কোটা ব্যবস্থায় কতক শর্ত আরোপ করা থাকে যা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ দ্রুত ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সংসদে

Dhaka University Institutional Repository

জেন্ডার গ্যাপ কমানো এবং নারীর সংখ্যাগত উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে অনেক দেশই এসকল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এরূপ কোটা পদ্ধতি নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিক সহায়ক বিবেচিত হয়েছে। কিছু কিছু দেশ এগুলো সংসদে অনুসরন করে এবং অন্যান্যরা রাজনৈতিক দলে কাজে লাগায়।

স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলো রাজনৈতিক দলগুলোতে কোটা পদ্ধতি ব্যবহার করে সংসদে নারীর অধিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে উদাহরণ তৈরি করেছে। বিপরীতভাবে দক্ষিন কোরিয়া, তাইওয়ান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং নেপাল সংসদে সংরক্ষিত আসন চালু করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কোটা ব্যবস্থায় সাধারণত প্রচলিত দুটি পদ্ধতি আছে -একটি হলো জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে গৃহীত ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়, রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে। উগান্ডা, আর্জেন্টিনা, ইটালি ও নামিবিয়ার মতো কিছু দেশ তাদের সংবিধান অনুযায়ী, লিখিত কোটা নীতি অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উগান্ডায় ৩৯টি জেলার প্রত্যেকটির সংসদীয়আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত। আর্জেন্টিনার Lay de Cupof জাতীয় আইনের একক উদাহরণ যেখানে সব রাজনৈতিক দল পার্টি লিস্টের মিনিমান কোটা গ্রহণ করেছে। Significant positive outcomes have been evident from Argentinan's 30 percent quota law. Female representation in the chamber of Deputies increased from 5.5 percent in 1991 to 12.8 percent in 1993 and 26.4 percent in 1998 (Del and FFeijoo, 1998: 42). [২]

যেসব দেশ কোটা ব্যবস্থায় সর্বাত্মক সাফল্য অর্জন করেছে তারা সংসদের চেয়ে রাজনৈতিক দলগুলোতে এগুলো অনুসরন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এসব দেশ তাদের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের সর্বোচ্চ বৈশ্বিক অবস্থান অধিকার করেছে। এগুলোর মধ্যে সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও নরওয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দলের অভ্যন্তরে নারী গোষ্ঠীর চাপের ফলে স্ক্যান্ডেনিভয়ার অধিকাংশ রাজনৈতিক দল কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এই কোটা ব্যবস্থা শুরু থেকে নমিনেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই পরিচালিত যারা আনুষ্ঠানিক কোটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা অন্ততঃপক্ষে পার্টি লিস্টে ৪০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে।

'During the 1970s and 1980s, the social democratic and left wing parties in Norway introduced quotas but most centre and right wing parties considered quotas in liberal' (Dahlerup, 1998:100)[৩]সমাজতান্ত্রিক বাম দলই প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

কোটা নীতি গ্রহণ করে। লেবার পার্টি ১৯৮৩ সালের সংসদীয় নির্বাচনে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ৪০ শতাংশ কোটা চালু করে। এটি যোগ্য নারী প্রতিনিধি নিয়োগ করতে সমস্যায় পড়েনি কারণ তাদের স্বাভাবিক লক্ষ্য ছিল অধিক নারীকে নির্বাচিত করা, শুধু দলীয় লিস্ট প্রস্তুত করা নয়। By implementing the quota system, it took three elements for women to reach about 50 percent of the parliamentary faction and 50 percent of the ministers when the labour party was in power (Dahlerup, 1998:104). [৪]

নরওয়ের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে, এই কোটা নীতি অনুসরনের ফলে নারী সদস্য লেবার পার্টিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে স্ক্যান্ডেনেভিয়ায় নারী দলীয় সদস্যের অনুপাত নরওয়েতে সবচেয়ে বেশি। সামগ্রিকভাবে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলিতে রাজনীতিতে সমতা আনয়নে কোটা সিস্টেম ইতিবাচক মাধ্যম হয়ে উঠেছে । অন্যান্য ক্ষেত্রেও এগুলোর বৃদ্ধি স্বাভাবিক ঘটনা।

নেদারল্যান্ড লেবার পার্টি ১৯৭৭ সালে তাদের লিস্টে অন্ততঃপক্ষে ২৫ শতাংশ নারী প্রার্থী বিশিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে। প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা বির্তক তৈরি হলেও, পরবর্তীতে এটি একটি কার্যকরী নীতি হয়ে উঠে (Outshoun, ১৯৯১)। এমনও নজির আছে যে রাজনৈতিক দলগুলো সংসদীয় প্রার্থী হিসাবে নারীদের জন্য তাদের অনানুষ্ঠানিক কোটা চালু করেছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সাধারণ পদ্ধতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস (ANC); অস্ট্রেলিয়ার লেবাব পার্টি এবং যুক্তরাজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রার সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে ।

৭৩টি দেশের প্রাপ্ত বিস্তারিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় সংসদে (এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিম্নকক্ষ) নারীর প্রতিনিধিত্ব ১৯৭৫ সনে শতকরা ১২.৫ থেকে ১৯৮৮ সনে শতকরা ১৪.৫-এ উন্নীত হয়েছে (ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়ন,১৯৮৮)। ১৯৮৭ সনে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এশীয় ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৭টি দেশের আইনসভায় (এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিম্নকক্ষ) নারীর উপস্থিতির হার শতকরা ৭.০।উইমেন ইন পলিটিক্স,১৯৯২)[৫] ১৯৮৭ সনে ইন্টার-পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্কভুক্ত রাষ্ট্রে নারীর পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদে উপস্থিতি সম্বন্ধে বলা যায়, ভূটানের জাতীয় পরিষদে (১৯৭৫) শতকরা ১.৩ জন মহিলা; ভারতীয় লোকসভায় (১৯৮৪) শতকরা ৭.৯; শ্রীলংকার আইনসভায় (১৯৭৭ সনে নির্বাচিত, ১৯৮২ সনে ১৯৮৩ থেকে ৬ বৎসরের জন্য মেয়াদ বর্ধিত) শতকরা ৪.৭; মালদ্বীপে পিপলস কাউন্সিলে (১৯৭৯) শতকরা ৪.০; নেপালে জাতীয় পঞ্চায়েতে (১৯৮৬) শতকরা ৫.৭ এবং পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে (১৯৮৫) শতকরা ৮.৮। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে ২০টি আসনই (মোট ২৩৭) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত; উল্লেখিত অন্যান্য রাষ্ট্রে

Dhaka University Institutional Repository

কোথাও সংরক্ষণ অথবা মনোনয়ন প্রথার মাধ্যমে নারী সংসদে অন্তর্ভূক্তি পেয়েছেন কিনা, উল্লেখ নেই(ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়ন,১৯৮৭)[৬] । ১৯৮৪ সনে ভারতে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে শতকরা ৩.০৩ জন ছিলেন মহিলা; ১৯৮৯ এর নির্বাচনে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩.০৮-এ (সুশীলা,পৃ-১০৮)[৭]। ১৯৯০ সনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদসমূহের মধ্যে শতকরা ৩.৫ জন ছিলেন মহিলা মন্ত্রী। ৯৩টি দেশের কোন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না (ইউ এন ১৯৯১)[৮]।

৫.৩ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে নারী

সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে মহিলাদের প্রার্থীতা ছিল ১৯৭৩ সনে শতকরা .৩, ১৯৭৯ সনে .৯, ১৯৮৬ সনে ১.৩, ১৯৮৮ সনে .৭ এবং ১৯৯১ সনে ১.৫। ১৯৯১ এর নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীতার সংখ্যা চল্লিশের উর্ধ্বে পৌঁছায় এবং ১৯৮৬ সনের দ্বিগুণের অধিক দাঁড়ায়। পৃথিবীব্যাপী নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরিসংখ্যানের পটভূমিতে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ,বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমতা ও সমদর্শিতার লক্ষ্য অর্জন সুদূর পরাহত এবং শুধুমাত্র বিশেষ পদক্ষেপ ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বিরাজমান ব্যবধান হ্রাস করা সম্ভব।

১৯৭০ থেকে নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের একটি ইতিবাচক ধারা লক্ষ্য করা যায়। বিগত বৎসরগুলির নির্বাচনী ফলাফল ও প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহিলা প্রার্থী ক্রমান্বয়ে ভোটারদের কাছে তাঁদের রাজনৈতিক ক্রেডিবিলিটি বা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁরা রাজনীতির অঙ্গনে জেন্ডার উদ্ভুত সমস্যা মোকাবেলা করে ভায়াবেল প্রার্থী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন।

৫.৪ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন

বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে, অতিরিক্ত ৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৫টি সংরক্ষিত আসন চালু করা হয়, প্রতি দশ বছরের নবায়নের ব্যবস্থা রেখে ৩৮০ সদস্যের সংসদে। এটি ১৯৭৮ সালে বাড়িয়ে ৩০ করা হলো এর দুটো পর পর সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে এই মেয়াদ বাড়ানো হলো।

যাইহোক, নবায়ন বিষয়ে ঐক্যমত্যের অভাবের কারণে, নারীরা ১৯৮৮ ও ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের সুযোগ পায়নি। সংরক্ষিত আসন নিয়ে ১৯৭৩-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নারী প্রতিনিধি গড়ে ১৯ শতাংশ ছিল এবং সংরক্ষিত আসন ছাড়াই এটি প্রায় ২ শতাংশ এসে দাড়াল। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ২৮ বছরের মধ্যে ৭টি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের ৩২ বছরের ইতিহাসে, সংরক্ষিত আসন নারীর সংসদে উপস্থিতিতে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। ২০০১ সালে মাত্র ২ শতাংশের শেষ হয়ে গেছে । প্রকৃতপক্ষে, সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে এসেছে। সে সময়ে পিতা ও স্বামী নারীদেরকে শিক্ষিত করে তুলত। এ বিষয়ে তাদের মনে এই ধারণা ছিল যে,

Except for a very few, it was thought women were dependent on men and needed special protection. The provision was continued in the new nation of Bangladesh in order that women could take part in the most important organ of the government in a parliamentary system (Karlekar, 1991, Choudhury, 1995). [৯]

এবারে সংরক্ষিত আসনের কার্যকরী ফর্মূলার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। ৩০০ জন সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্য নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নির্বাচন করতে পারেন। এসব নারীদের ভোটারদের সাথে কোন পরিচয় নেই এবং তৃণমূল পর্যায়েও কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তারা কোন আসনেরও প্রতিনিধিত্ব করে না। অতএব, সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন লাভকারী দল সাধারণত এসব নারীদের নির্বাচিত করার সুযোগ পায়।

পরবর্তীকালে এটি বিজয়ী দলের ভোট ব্যবস্থা বলে প্রতিফলিত হয়। তারা নিয়োগপ্রাপ্তও নয়, ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিতও নয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন প্রতিষ্ঠায় দুটো বিশেষ উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. কয়েকজন খ্যাতিমান নারী রাজনীতিবিদ ছিলেন যারা ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় সরাসরিভাবে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সরকারী দল আওয়ামী লীগ ১৯৭৩ সালের দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একটি নারী প্রতিদ্বন্দ্বীর নমিনেশন দেয়নি। যেদল গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা প্রচার করে তারা নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের একমাত্র উপায় হিসেবে সংরক্ষিত আসনসমূহ বিবেচনা করে। ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে সংবিধান ও সংসদ স্থগিত করা হলো। নারী গোষ্ঠীর নিকট থেকে কোন দাবি না আসায়, এই সামরিক সরকার ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং নারীদের জাতিসংঘ নারী দশক হিসাবে ঘোষণায় সমর্থনে উন্নয়নে নারীর অফিস স্থাপন করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ সালে সরকার নন গেজেটেড পাবলিক সার্ভিস পজিশনের ১০ শতাংশ কোটার ব্যবস্থা করে এবং ১৯৭৮ সালে সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসনের অনুপাত ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ হলো। Interesting enough, it is argued that the decision come as a surprise because the military regime wanted to increase the volume of donor assistance and picked up one of the donors favourate thems WID (Jahan, 1995, 42). [১০]

২. যেহেতু ৩০টি সংরক্ষিত আসন বড় বড় দলগুলোর অন্যায্য সুবিধা দান করে, রাজনৈতিক দলগুলোর কোনটিই Lucrative vote bank ব্যবস্থায় নিজেদের স্বার্থের বাইরে যেতে প্রস্তুত ছিল না এবং তাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ব্যতীত Provision কে বলবৎ করে রাখেনা। এই Provision ১৯৯১ সালে বিএনপি-কে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ-কে একক দলীয় সরকার গঠন করতে সহযোগিতা করে। সবসময় রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে একটি ভয় ছিল যে, সংরক্ষিত আসন ছাড়া বাংলাদেশ ১৯৯০ এর দশকে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে (আহমেদ ১৯৯৮, চৌধুরী ২০০০, IDEA ২০০১)[১১]।

৫.৫ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারীর অংশগ্রহণের সুফল

বিগত দু'টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে ৩৬ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৭ জন সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে ৩৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৬ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই তুলনায় বর্তমান সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি নারী প্রার্থীর সংখ্যা ৫৮ এবং বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যা ১৯-এ উন্নীত হয়েছে।

২০০৪ সালে অষ্টম সংসদে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এবং সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসনের অনুপাতিক হারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৪৫টি আসনের ক্ষেত্রে দলীয়ভাবে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ দলীয় কোটায় বিভিন্ন দল মনোনীত নারী প্রার্থীরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। এর ফলে সংসদে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা (১৯+৪৫)=৬৪ তে উত্তীর্ণ হবে। যা একটি রেকর্ড।

জাতীয় সংসদে সর্বাধিক নারী সদস্যই শুধু এবার নির্বাচিত হয়নি, মন্ত্রিসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও এবার অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদে ৫ জন

Dhaka University Institutional Repository

নারী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটাও একটা মাইলফলক নিঃসন্দেহে।

জাতীয় সংসদে সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব							
নির্বাচনের বছর	নারী প্রার্থীর হার %	সাধারণ আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত	উপনির্বাচনে বিজয়ী নারী	মোট নির্বাচিত নারী	সাধারণ আসনে নির্বাচিত মোট নারীর হার %	নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন	সার্বিকভাবে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব %
১৯৭৩	০.৩	-	-	-	-	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	-	২	২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	-	৪	১.৩	-	১.৩
১৯৯১	১.৫	৮*	১	৬	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩	১১*	২	৭	২.৭	৩০	১১.২
২০০১	১.৯	১৩*	-	৬	২.০	-	২.০
২০০৯	৫.২	২১*	-	১৯	১৫.৭	৪৫**	১৮.৫

* একাধিক আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি, নিয়ম অনুযায়ী একটি রেখে বাকি আসন ছেড়ে দেন।

** সংবিধান অনুযায়ী আরো ৪৫ জন নারীকে সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হবে

সূত্র- উন্নয়ণ পদক্ষেপ,স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট,২০০৯

১৯৭২-২০০১ সাল পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় নারীর উপস্থিতি/প্রতিনিধিত্ব				
সময়কাল	ক্ষমতাসীন দল	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	নারী মন্ত্রীর সংখ্যা	নারী মন্ত্রীর হার%
১৯৭২-১৯৭৫	আওয়ামী লীগ	৫০	২	৪
১৯৭৬-১৯৮২	বিএনপি	১০১	৬	৫.৯
১৯৮২-১৯৯০	জাতীয় পার্টি	১৩৩	৪	৩
১৯৯১-১৯৯৬	বিএনপি	৩৯	৩	৭.৬
১৯৯৬-২০০১	আওয়ামী লীগ	৪২	৪	৯.৫
২০০১-২০০৬	বিএনপি-জামাত জোট	৬০	৩	৫
২০০৯-২০১৪	আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট	৩৮	৫	১৩.১

Dhaka University Institutional Repository

নারী মন্ত্রী ২০০৯*		
নাম	পদমর্যাদা	মন্ত্রণালয়
শেখ হাসিনা	প্রধানমন্ত্রী	এছাড়া তার দায়িত্বে রয়েছে সংস্থাপন, প্রতিরক্ষা, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, ধর্ম, গ্রহায়ন ও গণপূর্ত, মহিলা ও শিশু, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়
মতিয়া চৌধুরী	মন্ত্রী	কৃষি মন্ত্রণালয়
অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন	মন্ত্রী	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ডা. দীপু মনি	মন্ত্রী	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মুন্নুজান সুফিয়ান	প্রতিমন্ত্রী	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

সূত্র- উন্নয়ণ পদক্ষেপ,স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট,২০০৯

৫.৬ জাতীয় সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসনের সমস্যা

নারীকে রক্ষা করার জন্য যে অধ্যাদেশ তা মূলত রাজনৈতিক দলগুলোকেই সুবিধা প্রদান করে। সরাসরি নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে নারীদেরকে অধিকহারে সুযোগ দেওয়ার বদলে, রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তি দেখালো যে, নারীদেরকে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হবে। এমনকি নূতন সহস্রাব্দে মাত্র ৩৭ (কিংবা ১.৯ শতাংশ) ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ১৯৩৩ জন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বির সাথে, এই ধরণের পারফরম্যান্স আশ্চর্যের কিছু নয়, যেহেতু নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্ধারিত কোন লক্ষ্য ছিল না, কোন দলেরও এ বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। সংসদে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য সংরক্ষিত আসনের অধ্যাদেশটিকে কার্যকরী করে তোলার জন্য এতো বছর এটি টোকেন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারী ও রাজনৈতিক দলগুলো নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এই যে, শাসক দল নারীদের নিয়োগ করলো যাদের ছিল না কোন দলীয় সংসদের কিংবা রাজনীতির অভিজ্ঞতা। এসব নারীদেরকে প্রায়ই অবমাননা করা হয়েছে তাদের পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার কারণে এবং সংসদের অলংকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তারা ভোটারদের মাধ্যমে নির্বাচিত নয় বরং নির্বাচিত সাংসদদের দ্বারা নির্বাচিত। উপরোন্ত তাদের বিশেষ আসনগত দায়িত্ব কর্তব্য নেই। পাঁচ বছর সেবা প্রদান করার পর এসব নারী তাদের নিজস্ব সংসদীয় ক্যারিয়ারের সুযোগ পায়। কেবলমাত্র পাঁচজন নারী ২০০১ সালের অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তারা সংরক্ষিত আসন থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সবাই সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ২৯ বছরে কেবলমাত্র একজন নারী বেগম খুরশীদ জাহান হক সরাসরি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি পূর্বে সংরক্ষিত আসনের একজন সাংসদ সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের মনোনয়ন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া অকার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো কোটার জন্য নারী সংগঠনগুলোর পুর্নদাবীকে উপেক্ষা করে গেছেন।

চৌধুরী (১৯৯৪, ৯৮) [১২]বলেন যে, সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা যে কেবল সংসদে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, এটি নারী প্রতিনিধিত্বশীল মর্যাদারও অবনতি ঘটিয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অনির্বাচিত ব্যাপারটি রাজনৈতিক দুর্বলতার স্বীকৃতি (আর সেই কারণে তারা সাধারণত কোন প্রতিবাদ করে না। জাহান (১৯৯৫) যুক্তি দিয়েছেন যে, নারীর কোটায় সংসদে যারা এসেছে তারা নারীর অগ্রগতির জন্য সামান্যই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই ব্যর্থতা উপলব্ধি করা যায় কারণ নারী সাংসদরা নারী আসন দ্বারাও মনোনীত হননি কিংবা সাধারণ আসন দ্বারাও মনোনীন হননি। নারীদের পশ্চাদপদতা দূর করার জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা বর্তমান সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখার জন্য কাজে লাগানো হয়েছে। চৌধুরীর মতে, নারী সাংসদের কার্যকারীতা এই প্রদর্শন করে যে, যদিও কোন গুনগত পরিবর্তন ঘটেনি, তাদের ভূমিকা ও কার্যাবলী সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

নারীর সংরক্ষিত আসন বিষয়ক 'রাজনীতি' একটি চলমান অবস্থায় আছে। বৃহত্তর দলগুলো প্রায়ই তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করে না এবং নারী এজেন্ডা এসব অবহেলিত প্রস্তাবনার মধ্যে খুব বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনামলে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ২০০১ সালের এপ্রিলে। ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ শেখ হাসিনা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, ৩০টি সংরক্ষিত আসনের পরিবর্তে একজন নারী পরবর্তী নির্বাচনে ৬৪ জেলার প্রত্যেকটি থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। ২০০০ সালের মধ্যে কয়েকটি নারী সংগঠন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন মনিটরিং কমিটি (ফেমা) ৪৬টি জেলা পর্যায়ের এবং ৫টি বিভাগীয় পর্যায়ে সংসদে নারীর আসন বিষয়ে নির্বাচনী আইন সংস্কারের বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে এবং সরকারের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে (খান, ২০০০)[১৩]। যাইহোক, ২০০০ সালের ১৭ জুন আইনমন্ত্রী একটি সংসদীয় সংশোধন বিল প্রবর্তন করে যেখানে পুরানো সংরক্ষিত আসনকে আরও ১০ বছরের জন্য প্রস্তাব করা হয়। নারী সংগঠনের সুপারিশসম্বলিত বিলটি সার্থক নয়। এতে নারী কর্মীরা বিচলিত ও অবাক হন। কয়েকদিনের মধ্যে মহিলা পরিষদ একটা সেমিনারের আয়োজন করে এবং এবার নারীদের জন্য ১৫০টি সরাসরি নির্বাচনের আসন দাবি করা হয়। যাইহোক, আওয়ামী লীগ, বিএনপির সমর্থন ছাড়া বিলটি পাস করতে পারে কারণ সাংসদদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন ছিল এবং বিএনপি সংসদ বর্জন করছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি কেবল যে সংসদ বর্জন করেছিল তাই নয় বরং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা না করার অভিযোগও করে। যাইহোক নারী সংগঠনগুলো বিএনপি-কে অভিযুক্ত করে বলে যে এটি কখনোই এই বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌছাতে পারেনি। "One of its longest serving and powerful Mps and the speaker of the current Parliament Mr. Jamiruddin Sircar, Preiviously commented that the majority of women did not care about the demand for women's incresed reserved seats and the principle of direct election. This is a headache for the well-off women (Chowdhury 2000)| [১৪] তদানীন্তন বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া যিনি সংসদ বর্জন করেছিলেন তাকে সংরক্ষিত আসন বিলের জন্য সংসদে আসার জন্য নারী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সংসদে সহযোগিতা না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যাইহোক, তিনি প্রস্তাব করলেন যে, সে যদি সরকার গঠন করতে পারে এই বিলটি সবচেয়ে বশী গুরুত্ব পাবে। তিনি ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর সরকার গঠন করেন কিন্তু নারীর সংরক্ষিত বিলটি এখনও পাস হয়নি।

রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিলটির ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে ফেলেছে। যেহেতু বিএনপি সংসদে দুই তৃতীয়াংশ আসনের বেশী জয়লাভ করেছে, তাই তারা নারীর ভোট ব্যবহার থেকে কোন সমর্থন প্রয়োজন নেই। নূতন সরকার গঠনের পর থেকে নারী সংগঠনগুলো আগের মতো এ্যাকটিভ রয়েছে এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ করার জন্য সরকারকে চাপ দিতে নারীর সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের বিষয়ক প্রায় ১০টি সেমিনার, কনফারেন্ট ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। যাইহোক, আইনমন্ত্রী ইতোমধ্যে তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন যে, বিলটি পাস হতে পারে কিন্তু এটি এই সংসদের জন্য কার্যকর নাও হতে পারে।

কোটা ও সংরক্ষিত আসন সংসদে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। তবুও এগুলোর কোনটিই বাংলাদেশী নারীর জন্য সুবিধাজনক হয়নি। অন্ততঃপক্ষে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা সংসদে নারীর অগ্রগতির জন্য অন্যতম রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড হয়ে উঠেনি। যাইহোক, সমস্যাটি ছিল নীতিতে যা সংসদে প্রয়োগ করেছে, রাজনৈতিক দলগুলোতে নয়। এবাবে নীতিটি দুর্বল ও অকার্যকর প্রমানিত হয়েছে। সংরক্ষিত আসনের কোন নির্দিষ্ট টার্গেট না থাকলে, নারীর সংসদীয় উপস্থিতি ৭ বা সাধারণ নির্বাচনে মাত্র ২ শতাংশ হতো। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ডোনার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

সরকার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা চালু করেছে। যেহেতু তারা এর কোন ব্যাখ্যা দেয় না, তাই নারী গোষ্ঠী এতে কোন আগ্রহ দেখায় না।

নারী সংগঠনগুলোর দাবি ছিলো সরকারের এক-তৃতীয়াংশ পদে নারীদের স্থান দেয়ার। সে দাবিকে সব সরকারই পাশ কাটিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পরে এদেশের নারী আন্দোলনের কর্মীরা রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি তুলেছিলো। কিন্তু সেই দাবিকে উপেক্ষা করে তৎকালীন সরকার জাতীয় সংসদে মাত্র ১৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখে। পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের চাপে সরকার সংরক্ষিত নারী আসন ১৫ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করে। সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হলে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার মনোনয়ন পদ্ধতির কোন রকম পরিবর্তন না করেই দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করে।

নারীর জন্য সংরক্ষিত এই আসনগুলোতে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্যের পরোক্ষ ভোটে সংরক্ষিত আসনের জন্য নারী সদস্য নির্বাচিত হতেন। সংসদের ৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যরা ছিলেন প্রায় সকলেই পুরুষ; কাজেই সংরক্ষিত নারী আসনের সকল নারী সদস্য বাস্তবে পুরুষ সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। ফলে সংসদের সাধারণ আসনে যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো, সেই দলের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচন সুনিশ্চিত ছিলো। বস্তুত নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতে কখনও ভোটাভুটি হয়নি; সকল সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতেন। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের বেশিরভাগ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তেমন সংযুক্ত ছিলেন না; তাদের তেমন রাজনৈতিক পটভূমি ছিলো না। নারী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বা নারীর চাহিদা সম্পর্কে সচেততার অভাব ছিল। মোট কথা, নির্বাচন বা মনোনয়ন দানের ব্যাপারে নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান আছে কিনা, তা বিবেচনা করা হতো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নয়, বরং রাজনৈতিক দলের উপর মহলের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুপারিশ মনোনয়নের চাবিকাঠি ছিলো। মূলত সংরক্ষিত আসনগুলো ছিলো শুধু অলঙ্কারিক। কেননা রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুপাতে ওই সংরক্ষিত আসনগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। এসব আসনে নারীরা মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য পদ পান বলে রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্য থাকে। জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

নারী প্রতিনিধিরা মূলত দলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। সংসদে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী হওয়া সত্ত্বেও নারী সংসদ সদস্যদের বৈষম্যমূলক, অধস্তন অবস্থানে থাকতে হয়েছে। আর তা ছাড়া আমাদের দেশে নারী বিরোধী সংস্কৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার কারণেও নারী নেতৃত্ব খুব একটা এগুতে পারে না। নারী সদস্যরা যাই করুন তাই নিয়ে সমালোচনা করার প্রবণতা লক্ষণীয়। নারীদের পোশাক, চুলের স্টাইল, কথা বলার ধরন, জীবন-যাপন পদ্ধতি, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ- সবই আলোচনা-সমালোচনার বিষয়। শুধু তাই নয়, বিবাহিত হলে 'পরিবারের প্রতি মনোযোগী নয়' বলে অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হন, আর অবিবাহিত হলে তার ওপর নানা রকম কুৎসা ও চারিত্রিক কালিমা লেপন করা হয়। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বললে বলা হয়- উগ্রবাদী এবং মূল সমস্যার প্রতি অমনোযোগী। দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণজনিত সমস্যার বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার শিকার হতে হয়েছে নারী সংসদ সদস্যদের। বাংলাদেশের কাজের পরিবেশ পুরুষ নিয়ন্ত্রণাধীন যা নারীর জন্য চরম প্রতিকূল। নারী সংসদ সদস্যরা যা হারে হারে টের পেয়েছেন।

আর তাছাড়া পরোক্ষ নির্বাচন কখনো প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিকল্প হতে পারে না। বিশ্বের গণতান্ত্রিক সকল দেশে আইন পরিষদে নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে, সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কাজেই পরোক্ষ নির্বাচনে যে সকল নারী সদস্য হয়েছিলেন, তারা জনগণের সরাসরি ভোটে সাধারণ আসনে নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের সমক্ষমতা বা সমমর্যাদা দাবি করতে পারেননি। প্রত্যক্ষ নির্বাচন থেকে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করা যায়, তার সঙ্গে পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাপ্ত ক্ষমতার তুলনা হয় না।

একটি সংরক্ষিত নারী নির্বাচনী এলাকা বস্তুত ১০টি প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনী এলাকার সমান। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত একজন নারী সদস্যের বিপরীতে একই নির্বাচকমণ্ডলীও নির্বাচনী এলাকার ১০ জন সরাসরি নির্বাচিত পুরুষ সদস্য ছিলেন। এমন বিসদৃশ পরিস্থিতিতে, নারী সদস্যগণ পুরুষ সদস্যদের অনুরূপ কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করতে পারেননি। দাবি আদায় করার কথা ভাবতেও পারেননি। একজন পুরুষ সদস্য তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে যত নিবিড় ও কার্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, দশ গুণ বড়ো নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে নারী সদস্য ততো ফলপ্রসূ যোগাযোগ রাখতে সক্ষম নন। নির্বাচনী এলাকা যত বড়ো হবে নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে গণসংযোগ ততো কম হতে বাধ্য। অন্যদিকে নির্বাচন যদি পরোক্ষ স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যবৃন্দ ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি। ক্ষমতা ধারণ ও প্রয়োগ করতে অসমর্থ হয়েছে। তাদের কার্যকারিতা জনগণ উপলব্ধি করতে পারেননি। তারা আমাদের দেশের নারীর যে প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা- নারী নির্যাতন রোধ বা পরিবার ও পরিবারের বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে অবদান রাখতে পারেননি।

এজন্য অবশ্য নারী সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের দায়ী করা ঠিক নয়। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী পুরুষ-প্রধান পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়, সে ব্যবস্থা ও পরিবেশ উভয়ই নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধক ও বৈষম্যমূলক। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে নারী রাজনীতিবিদগণ বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব খাটাতে অক্ষম হবেন এটাই স্বাভাবিক। নারীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে হলে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার তথা মন্ত্রিপরিষদ এবং জাতীয় সংসদ উভয় প্রতিষ্ঠানের মূলে রাজনৈতিক দল।

৫.৭ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইসতেহারে নারী ইস্যু

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের দাবি এবং চর্চার ফলে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক আলোচনাগুলো সাধারণের চর্চায় কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সিডও সনদের অনুমোদন, জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য সিডও সনদের আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন (যদিও ১৯৯৭ সালে প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণীত হয় এবং ২০০৮ সালে কিছু কিছু রদবদলের মাধ্যমে পুনরায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালঅ ঘোষণা হয়), জেন্ডার বাজেটিং এর মতো পরিকল্পনা পর্যায়ের বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। নির্বাচনের আগে মানবাধিকার এবং নারী সংগঠনসমূহ, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দল ও সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করে এবং এইসব আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুপারি ইশতেহার প্রকাশের আগেই রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট পাঠানো হয়। আশা করেছিলাম ইশতেহারে এইসব পরিকল্পনা ও উদ্যোগের সুস্পষ্ট প্রতিফলন থাকবে। ইশতেহারগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছি আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ইশতেহারে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের প্রশ্নে নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করেছে। আওয়ামী লীগ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ১৯৯৭ পুনর্বহাল এবং কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। অন্য তিনটি দলের (বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী) ইশতেহারে নারী প্রশ্নে সুস্পষ্ট কোনো নীতিগত অবস্থান নাই বরং কিছুটা বিচ্ছিন্ন এবং খাপছাড়াভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন: জামায়াতের ইশতেহারে নারীর যথার্থ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে কিন্তু এই 'যথার্থ' এর অর্থ কি তা স্পষ্ট নয়। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে নীতিগত অবস্থান পরিষ্কারের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: প্রতিটি ইশতেহারেই শিক্ষা বিশেষ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগের কথা বলা হলেও শিক্ষা কার্যক্রমে নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সকল অনুষঙ্গ বাদ দেয়ার দাবিটি বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে। নারীর প্রতি নেতিবাচক, অবমাননাকর, সনাতনি দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও প্রচার নীতিমালাকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার যৌক্তিক এবং সময় উপযোগী দাবিটিও কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে উল্লেখিত হয়েছে। নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের বিষয়গুলোকে বৃহত্তর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই পদক্ষেপগুলো অন্য দলের ইশতেহারভুক্ত হওয়া খুবই জরুরি ছিল। নারীর রাজনৈতিক সম-অধিকারের লক্ষ্যে নারী আন্দোলনের দাবির প্রতিফলন পাওয়া গিয়েছিলো বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘোষণায়, যে রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সব পর্যায়ের কমিটিতে এবং সংসদে নারীর জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য ছিলো রাজনীতিতে এখনো যোগ্য নারীর অভাব রয়েছে তাই এক্ষেত্রে কিছুটা সময় প্রয়োজন। এরই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ও সরকার ঘোষণা দেয় সকল রাজনৈতিক দলকে ২০২০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে এবং এ বিষয়টিতে অঙ্গীকার করে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন পায়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে ৩৩% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের ২০২১ সালের রূপকল্পে এবং জাতীয় পার্টির আগামী দশ বছরের লক্ষ্যমাত্রাতে তা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামীর ইশতেহারে এ বিষয়ক কোনো ভাবনাই প্রকাশিত হয়নি। সম্পত্তিতে সম-অধিকার, বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একক পারিবারিক আইন এবং সম-নাগরিকত্ব আইনের দাবিগুলো বর্তমান প্রেক্ষিতে নারী আন্দোলনের অন্যতম দাবি। ইশতেহারে এই দাবির প্রতিফলন 'নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করা হবে' (আওয়ামী লীগ), 'বিদ্যমান পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে তা দূর করা এবং ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড চালু করা' (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি) এভাবে দুটি দলের ইশতেহারে উল্লেখিত হলেও অন্য তিনটি দলের (বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী) ইশতেহারে তার কোনো উল্লেখ নাই। তবে আওয়ামী লীগের ইশতেহার থেকে স্পষ্ট হয় না কোন কোন বৈষম্যমূলক আইন তারা সংশোধন করবে। প্রত্যেকটি দলের ইশতেহারেই ঢালাওভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। যেমন, বিএনপির ইশতেহারে যৌতুকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন, এসিড সংক্রান্ত আইন দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন, নারী ও

Dhaka University Institutional Repository

শিশু পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নেয়া; আওয়ামী লীগের ইশতেহারে নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেয়া এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; জাতীয় পার্টির ইশতেহারে নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য পারিবারিক আদালতের কার্যকারিতা অধিকতর শক্তিশালী করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বন্ধের জন্য সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো এবং দ্রুত বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা; জামায়াতে ইসলামীর ইশতেহারে এসিড নিক্ষেপ, ঘৃণ্য যৌতুক প্রথাসহ সকল ধরনের নারী এবং শিশু নির্যাতন কঠোরহস্তে দমন করা এবং কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে যৌতুক প্রথা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন কার্যকরভাবে রোধ করা, নারী ও শিশু পাচার রোধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ধারা সনাক্ত করা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে। নারী নির্যাতনের বহুমাত্রিকতা এবং নানা ধরন মোকাবেলায় এই ধরনের ঢালাও কথাবার্তা কিভাবে নারীর প্রতি অব্যাহত নানা ধরনের নির্যাতনকে মোকাবেলা এবং প্রতিরাধ করবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইশতেহারগুলোতে বর্তমান সময়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবি কর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন নীতিমালা ও আইন এবং রাস্তা-ঘাটে যৌন হয়রানি বন্ধের জন্য আইনকে শক্তিশালী করার বিষয়গুলো বড় দলগুলোর ইশতেহারে একেবারে অনুপস্থিত হলেও কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। বাংলাদেশে বিগত সময়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ হিসাবে নারীর উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন ঘটেছে; বিশেষ করে ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ে বাংলাদেশে 'সংখ্যালঘু' জনগোষ্ঠীর নারীর উপর যে মাত্রায় নিপীড়ন ও নির্যাতন সংঘটিত হয়েছিলো তা সাম্প্রতিক সময়ে মানবাধিকার লংঘনের ভয়াবহতম উদাহরণ। নির্যাতনের আশংকায় অনেকেই ভোট না দিয়ে অন্যত্র চলে যাবে। সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের এইসব ধরন মোকাবেলা করা রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। তবে এখনো পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারনায় ও ইশতেহারে এবিষয়ে আশাপ্রদ কিছু পাওয়া যায়নি।

এই পাঁচটি রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে মৌলিক ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি দলই তাদের ইশতেহারে নারী বিষয়ক আলাদা একটি অনুচ্ছেদ রেখেছে। বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এটাকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে আওয়ামী লীগ (নারীর ক্ষমতায়ন) ছাড়া অন্য দলগুলোর ইশতেহারে নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদটির যে নামকরণ করা হয়েছে তা নারীর এজেন্সী বা সক্রিয়তাকে উপেক্ষা করে নারীকে বস্তুকরণ করে। যেমন: বিএনপির (নারী ও শিশু অধিকার), জাতীয় পার্টির (নারী ও শিশু অধিকার), বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

জামায়াতে ইসলামীর (নারী ও শিশু অধিকার) এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (নারী সমাজ) থেকে মনে হয় নারী ও শিশু একটি অভিন্ন এবং সম ক্যাটাগরি। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে ইশতেহারে নারী বিষয়ক আলাদা একটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা হলেও নারী বিষয়টিকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিলো।

৫.৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এবার রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ও নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে ন্যূনপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে এবার নারী রাজনীতিবিদদের মনোনয়ন প্রাপ্তির হার ছিলো পূর্বের যে কোনো নির্বাচনের তুলনায় বেশি। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র পেশ ও যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্তভাবে মোট ৫৮ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এরমধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে ১৯ আসনে ১৭ জন, বিএনপি থেকে ১৫ আসনে ১৩ জন, যুক্তফ্রন্ট থেকে ৯ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ২ জন, সিপিবি থেকে ২ জন, ন্যাপ থেকে ১ জন এবং স্বতন্ত্র ৮ জন। উল্লেখ্য যে জামায়াতে ইসলামীর কোনো নারী প্রার্থী ছিলেন না। কয়েকটি আসনে মৃত কিংবা কারা অন্তরীণ সাবেক মন্ত্রী/প্রভাবশালী নেতার স্ত্রীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। নির্বাচনে ২২টি আসনে ১৯ জন নারী প্রার্থী জয়লাভ করেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৭ জন প্রার্থীর ১৫ জন জিতেছেন, বিএনপির ১২ জনের মধ্যে ৩ জন এবং জাতীয় পার্টির ২ জনের মধ্যে ১ জন জিতেছেন। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের দুই শীর্ষ নেত্রী তিনটি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনটিতেই নির্বাচিত হয়েছেন। বেশ কয়েকটি আসনে পরাজিত দলের নারী প্রার্থীরাও জয়লাভ করেছেন। এর মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা আগে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন, এবার তারা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই বিজয়ী হয়েছেন। উল্লেখ্য যে অষ্টম সংসদে নির্বাচিত নারী সদস্য সংসদের শতকরা ৭ ভাগেরও বেশি, যা আগের সংসদের তুলনায় তিনগুণের বেশি।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে এবারের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে বিজয়ী নারী প্রার্থীর সংখ্যা। এসব নারী প্রার্থীরা পুরুষ প্রার্থীদের সঙ্গে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতেছেন, অনেকে বিপুল ভোটের ব্যাবধানে জিতেছেন। এবার এটা প্রমাণিত হয়েছে যে নারীরাও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে প্রচার-প্রচারণা করতে জানে, সরাসরি মোকাবেলায় পুরুষের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে। আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিলো যে, রাজনৈতিক অঙ্গন এবং পরিবেশ নারীদের জন্য অনুকূল নয়। এখানে পুরুষদের প্রতাপ-প্রতিপত্তির সঙ্গে নারীরা পেরে উঠবেন না। নির্বাচনী সংস্কৃতির সঙ্গে নারীদের তেমন সম্পৃক্ততা না থাকায় নির্বাচনে তাদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হলে তারা হেরে যাবেন। তাছাড়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো যোগ্য নারী প্রার্থীর অভাব রয়েছে। কিন্তু এবার

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ হয়ে গেছে যে সুযোগ পেলে এবং অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, কালো টাকা ও পেশী শক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন হলে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনোভাবেই পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে থাকেন না। তাছাড়া নারী রাজনীতিবিদরা তুলনামূলকভাবে সৎ, শিক্ষিত, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, উন্নয়নমুখী এবং নিবেদিতপ্রাণ বলেও অতীতে দেখা গেছে।

বিগত কয়েকটি নির্বাচনের মতো আগামী সংসদেও সরকারি ও বিরোধী দুটি দলের প্রধান নেতাই হতে যাচ্ছে নারী। সুতরাং পরিবেশ, ধর্ম, সমাজ, পারিবারিক মূল্যবোধের দোহাই দিয়ে রাজনীতি থেকে নারীদেরকে আর দূরে থাকতে বলা, সংরক্ষিত আসনের অলংকার বানিয়ে রাখা কিংবা মনোনয়নবঞ্চিত করার দিন শেষ। এ নির্বাচনে যে প্রবণতা দেখা গেছে তাতে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত ৩৩% নারী প্রতিনিধিত্বর জন্য ২০২০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা

১. Lijphart, A. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty six countries. London, Yale University Press, 1999.

২. Del M and C.Feijoo 'Democratic Participation and Women in Argentina', the jop Hopkins University Press London, 1998

৩. Dahlerup, D. 'Using quotas to increase women's political representation .in a A. Karam (ed.), Women in parliament: Beyond numbers, IDEA, Stockholm, 1998

৪. Opcit,1998

৫. Women in Politics and Decision-Making, p.10.

৬. Inter-Parliamentary Union, Distribution of Seats Between and Women in National Assemblies (Geneva, 1987).

৭. Sushila Kaushik, 'Women, Women's Issues and Ninth General Elections' in C.P. Bhambri *et al* ed; *Teaching Politics, Special Issue on Ninth Lok Sabha Elections-Some Inter-pretations*, vol. xv, pp. 108-115.

৮. United Nations, *Women: Challenges to the Year-2000* (New York, 1991), p.32.

৯. Karlekar, M. Voices from within: Early personal narratives of Bengali women, Oxford, Oxford University Press, 1991.

Choudhury, D "Women's Participation in the formal structure and Decision Making Bodies in Bangladesh', In R Jahan (ed), Empowerment of Women: Nairobi to Beijing (1985-1995), Women for Women:A research and Study group,Dhaka,1995.

Dhaka University Institutional Repository

১০. Jahan,R.The Elusive Agenda :Mainstreaming Women in Development.London,Zed Books,1995.

১১. Ahmed, N. 'In search of Institutionalization: Parliament of Bangladesh', Journal of Legislative Studies 4 (4),1998.

Choudhury,D.The politics of women's representation in the national legislature.Accessesed 30 september ,2000.

১২. Choudhury N. 'bangladesh :Gender issues and politics in a patriarchy'in B.J nelson and N Choudhury (eds) Women and Politics Worlwide ,Yale University Press, London,1994.

১৩. Khan,M. Direct Election for Women MPs .Accesessed 26 July .2000.

১৪. Chowdhury ,Najma, 'Bangladesh: Gender Issues and Politics in a pateriarchy, in Nelson and Chwdhury ed., *Women and Politics*.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনে নারী বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়: জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনে নারী বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনে নারী বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে উত্তরদাতাদের ৫টিক্যাটিগরিতে বিভক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে-৬০ জন নারী এবং ৪০ জন পুরুষ,সাধারন আসনে নির্বাচিত ২ জন নারী,সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ৩ জন নারী এবং ১ জন নারী নেত্রীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।সাধারন নারী পুরুষের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সারণী ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।অন্যদিকে নারী সাংসদ ও নারী নেত্রীদের নিকট থেকে কেস স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে ।নিম্নে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো

৬.১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে সাধারণ নারী পুরুষের অভিমত

বাংলাদেশের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক এবং এখানে ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব অনেক বেশী। অধিকাংশ পরিবার ধর্মীয় অনুশাসনে বাঁধা। বর্তমানে নারীরা শিক্ষিত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তাদের নিজস্ব অধিকার আদায়ে তারা সোচ্চার। অধিকার আদায়ের জন্য রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান গবেষণায় আমরা ৪০ জন পুরুষকে প্রশ্ন করেছি যে তারা রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণে কোন বাধা দেয় কিনা কিংবা অংশগ্রহণ পছন্দ করে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে ৭৫ শতাংশ পুরুষ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সমর্থন করেছে এবং বাকী ২৫ শতাংশ সমর্থন করেনি। সমর্থন না করার কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছেন যে, পরিবারের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় কারণে তারা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সমর্থন করেন না। অন্যদিকে ৬০ নারীকে অনুরূপ প্রশ্ন করা হলে তাদের ৮৩.৩৩ শতাংশ নারী মনে করেন রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত কেননা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কারণে রাজনীতিই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তারা তাদের অধিকার আদায় করতে পারে। বাকী ১৬.৬৭ শতাংশ নারী ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পিতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে পদার্পন করাকে সমর্থন করেন না। উপরের আলোচনায় এটা লক্ষ্য করা যায় যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা নিজেদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে বেশি পছন্দ করেন।

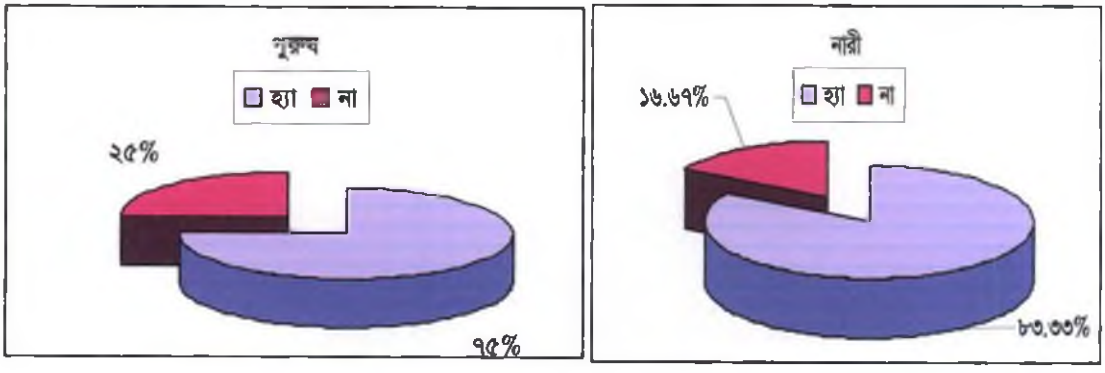

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা

রাজনীতিতে স্বতস্ফুর্ত অংশ্রগহণ নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করে। আর রাজনীতিতে সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারী তার মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হলো ১. নারীর অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক নিম্নাবস্থান, ২. দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর রক্ষণশীল মানসিকতা, দারিদ্র্য ও পরনির্ভরশীলতা, ৩. রাজনীতি সম্পর্কে অসচেতনতা, ৪. প্রচলিত রক্ষনশীল সামাজিক প্রথা এবং ৫. সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও মূল্যবোধের কারণে নারীর অত্যন্ত কাছের মানুষ- স্বামী, বাবা ও ভাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসারক্ষেত্রে বাধা দেন প্রচন্ডভাবে। রাজনৈতিক দলগুলোতে সন্ত্রাসী, মাস্তান নির্ভর ও কালো টাকার প্রতিযোগিতার রাজনীতিতে নারী রাজনৈতিক কর্মীদের অবস্থান নেয়া এবং টিকে থাকা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য ব্যাপার ।

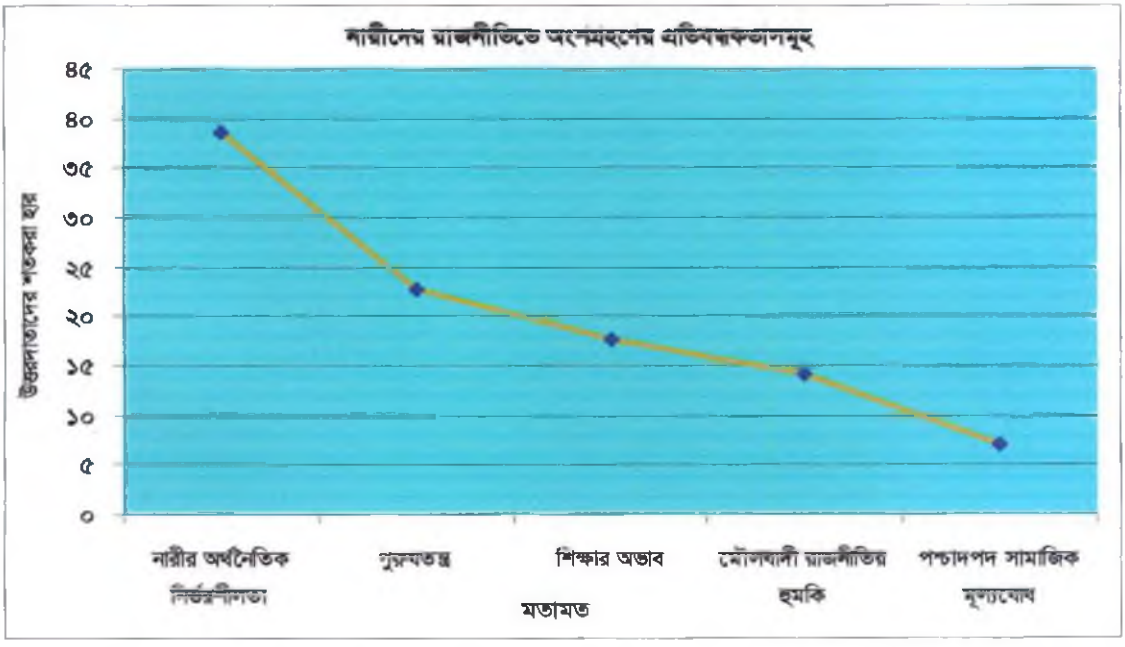

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুব নগন্য এবং প্রান্তিক। এটি সার্বিক ক্ষমতাহীনতার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু নারীকর্মী, সিভিল সমাজ ও অনেক বেসরকারী সংগঠন (এনজিও) এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বড় বড় বাধাসমূহ কি এ প্রশ্নের উত্তরে একটা বড় চার্ট স্থাপন করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১. নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা (৩৮.৬০%)

২. পুরুষতন্ত্র (২২.৪০%)

৩. শিক্ষার অভাব (১৭.৫৪%)

৪. মৌলবাদী রাজনীতির হুমকি (১৪.০৪%)

৫. পশ্চাদপদ সামাজিক মূল্যবোধ (৭.০২%)

অধিকাংশ সদস্যই উল্লেখ করেছেন যে, নারীদের অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত রাজনীতিতে তাদের ভিত প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

৬.৩. গণতান্ত্রিকায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অবদান

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ খুব ধীর এবং কঠিন। পিতৃতন্ত্র ও মৌলবাদের কারণে গণতন্ত্রে নারীর দাবি বেমানান বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে নারীরা অধঃস্তন হিসাবে প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণায় সাধারণ নারী ও পুরুষদের নিকট রাজনীতিতে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীরা কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার উত্তরে ৩৩.৩৩ শতাংশ নারী মনে করেন নারীদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদের অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, সরকার ও পরিবার সবাইকে তাদের সহযোগিতা করতে হবে। অন্যদিকে ৫ শতাংশ নারী বলেন নারী সাংগঠনিক নেতৃত্ব বা পদ নগরকেন্দ্রীক হওয়ায় তৃণমূল পর্যায়ে তাদের প্রভাব স্বল্প। তাই এ পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।তারা আরোও বলেন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের চেতনা, বিশ্বাস ও আচরণে অদ্যাবধি নিরপেক্ষ নয়।এক্ষেত্রে ৬ শতাংশ নারী পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের পরিবর্তনের দাবি জানান। তবে তারা মনে করেন বাধা থাকলেও সেগুলো অতিক্রম করা সম্ভব। কেউই মনে করেনা যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কোন ভবিষ্যৎ নেই।অন্যদিকে পুরুষদেরকে একই প্রশ্ন করা হলে ৩৭ শতাংশ পুরুষ সরাসরি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের উপর জোড় দেন।তবে নারীদের চেয়ে পুরুষরা তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

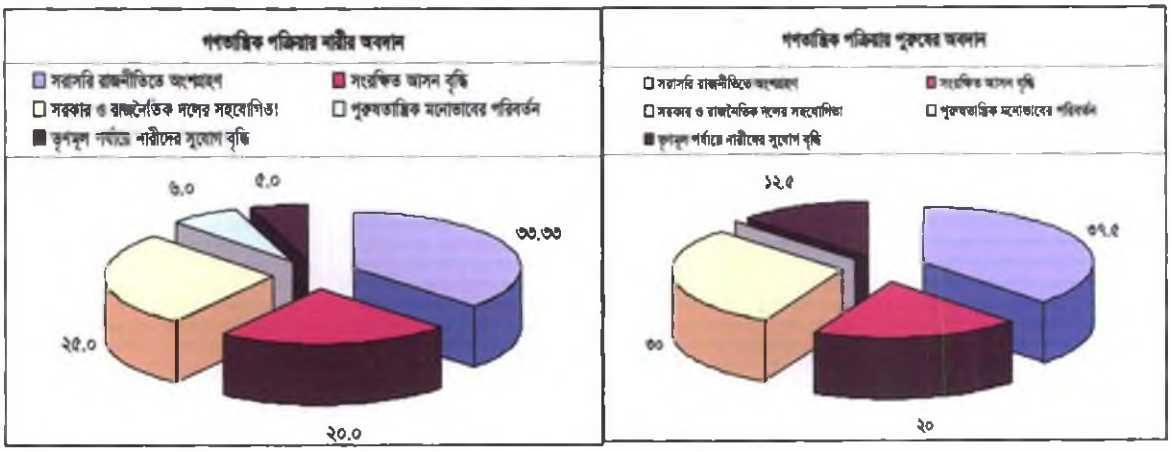

৬.৪ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়ে অভিমত

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদের সংসদীয় জীবন কখনই ফুলশয্যার ছিল না। জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনামলে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তৃতীয় সংসদের নারী সাংসদ সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য করে লিখেছিল ৩০ সেট গহনা। এরশাদের শাসনামলে পুরো সংসদকে ব্যবহার করা হতো রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে এবং নারী সাংসদদের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য মারাত্মক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরশাদের পতনের পর নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং পঞ্চম সংসদ প্রতিষ্ঠিত হলো। এর প্রথম সেশনেই পঞ্চম সংসদ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাস করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং সংসদের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেল। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদের নেতা ও বিরোধী নেতা হিসাবে দু'জন নারী নির্বাচিত হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও নারী সাংসদদের ভাবমূর্তি সাধারণ জনগণের কাছে মর্যাদার আসন লাভ করেনি।

৩৩.৩৩ শতাংশ নারী উত্তরদাতা মনে করে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ১০ বছরের জন্য করা প্রয়োজন, ২৫ শতাংশ নারী ১৫ বছরের জন্য এবং ১৬.৬৬ শতাংশ ২০ বছরের জন্য করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন । অন্যদিকে পুরুষদের মধ্যে ২২ শতাংশ ২০ বছরের জন্য এবং ২২.৫ শতাংশ পুরুষ ২০ বছরের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যাবস্থা করার জন্য প্রস্তাব করেন যা নারী উত্তরদাতাদের তুলনায় অনেক বেশি । যাইহোক নারী পুরুষ উভয় উত্তরদাতা সংরক্ষিত আসনের প্রভাব সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষন করেছে। তারা বলেছে যে, সংরক্ষিত ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে নারী স্বার্থ পূরণ করেছে। এরুপ না থাকলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণও অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। আজ পর্যন্ত নারীরা নারী সাংসদের নিকট থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে তা তাদের অন্য কোন পুরুষ সাংসদদের নিকট থেকে আশা করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

	নারী (৬০)		পুরুষ (৪০)	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
আরও ১০ বছর	২০	৩৩.৩৩	১২	৩০.০
আরো ১৫ বছর	১৫	২৫.০	৮	২০.০
আরো ২০ বছর	১০	১৬.৬৬	৯	২২.৫
স্থায়ীভাবে	৮	১৩.৩৩	৭	১৭.৫
অন্যান্য	৭	১১.৬৬	৪	১০
মোট	৬০	১০০.০	৪০	১০০.০

সূত্র- সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে

৬.৫ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচন বিষয়ে অভিমত

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুসারে বাংলাদেশে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন মাত্র ৪৫টি। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৯ জন নারী প্রার্থী সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন। সংরক্ষিত আসনগুলোতে সাধারণ আসনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে নারী প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। ফলে যে সরকার ক্ষমতায় থাকেন সংরক্ষিত নারী আসনগুলোতে দলীয় প্রার্থীরাই বিজয়ী হন। সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন করার ব্যাপারে উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। নারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০% মনে করেন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন করা উচিত প্রত্যক্ষভাবে (নারী ও পুরুষ ভোটারদের মাধ্যমে)। এছাড়া ১১.৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন যেহেতু নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন তাই তা হওয়া উচিত প্রত্যক্ষভাবে (কেবলমাত্র নারী ভোটারদের মাধ্যমে)। অন্যদিকে পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬২.৫% মনে করেন সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন করা উচিত প্রত্যক্ষভাবে (নারী ও পুরুষ ভোটরদের মাধ্যমে)। কিন্তু ২৫% উত্তরদাতা পরোক্ষভাবে (সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে) নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন করার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন। অর্থাৎ দেখা যায় যে, নারী-পুরুষ বেশিরভাগ উত্তরদাতাই মনে করেন যে, সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন করা উচিত প্রত্যক্ষভাবে (নারী ও পুরুষ ভোটারদের মাধ্যমে)।

Dhaka University Institutional Repository

n =100

নারী (৬০)			পুরুষ (৪০)		
ক	খ	গ	ক	খ	গ
৬.৬৭ (৮)	৮০ (৪৮)	১১.৩৩ (৮)	২৫ (১০)	৬২.৫ (২৫)	১২.৫ (৫)

সূত্র- সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে

৬.৬ জাতীয় সংসদের সধারন আসনে নারী সাংসদ সদস্য নির্বাচনে কোটা পদ্ধতি

বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রধান হচ্ছেন নারী। বিভিন্ন মেয়াদে তারা দেশ পরিচালনা করেছেন। তাদের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে অনেক নারীই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের নারীরা নারীর ক্ষমতায়নের সূচকে ৩য় বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই নারীদের জন্য সুসংগঠিত নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধি না রেখে বরং প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই নারীদের জন্য বিশেষ কোটা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়ে নারীপ্রতিনিধিদের জন্য আলাদা কোটা রয়েছে। উপজেলা পরিষদে সারা বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা হতে একজন করে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তৃনমূল পর্যায়ের এই নারী নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে আসতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর আরও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তারা দলের সাধারণ আসনে নির্বাচনের জন্য নারীদের বিশেষ কোটা রাখতে পারে। নারী উত্তরদাতাদের সবাই এবং পুরুষদের মধ্যে ৭৫% এই বিষয়ের সাথে একমত পোষণ করেন। নারী উত্তরদাতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৯১.৬৭%) মনে করেন, রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত নারীদের জন্য মনোনয়নের হার ৩০ ভাগ করা উচিত। এর সাথে ৬০% পুরুষ উত্তরদাতাও একমত পোষণ করেন। তবে ১২% পুরুষ উত্তরদাতার মতে মনোনয়নের হার হওয়া উচিত ২০ ভাগ। উত্তরদাতাদের বেশিরভাগ মনে করেন রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত সাধারণ আসনে নির্বাচনের জন্য নারীদের জন্য বিশেষ কোটা রাখা এবং সেটা হওয়া উচিত ৩০ ভাগ।

n =100

নারী (৬০)		পুরুষ (৪০)	
হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
১০০ (৬০)	০.০ (০)	৭৫.০ (৩০)	২৫.০ (১০)

সূত্র- সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে

Dhaka University Institutional Repository

n =90

নারী (৬০)			পুরুষ (৪০)		
ক	খ	গ	ক	খ	গ
৩.৩৩ (২)	৫.০ (৩)	৯১.৬৭ (৫৫)	৬০.০ (১৮)	১১.৬৭ (১৮)	৮.৩৩ (৫)

সূত্র- সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে

৬.৭ .বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী এবং সংরক্ষিত নারী আসন

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুসারে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫টিতে উন্নীত করা হয়েছে। অনেকে এটাকে নারী ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রা হিসেবে দেখেছেন। যদিও জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নারী জনসংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি (জনসংখ্যার অনুপাত দিতে হবে, sex ration from BBS)। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী ভোটার পুরুষের তুলনায় বেশি ছিল। এ বিষয়ে আলোকপাত করলে প্রতীয়মান হয়ে যে, নারী জনসংখ্যা এবং নারী ভোটারের তুলনায় সংরক্ষিত নারী আসন যথেষ্ট নয়। যদিও সর্বক্ষেত্রে এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে যে, ৭৮.৩৩% নারী উত্তরদাতা মনে করেন যে, সংরক্ষিত নারী সাংসদের সংখ্যা ৪৫ করা পর্যাপ্ত হয়নি। পুরুষ উত্তরদাতাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ (২৭.৫) নারীদের এই মত সমর্থন করেন। অন্যদিকে মোট পুরুষ উত্তরদাতাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ (৭২.৫%) চতুর্দশ সংশোধনী পাশ করে সংরক্ষিত নারী সাংসদের সংখ্যা ৪৫ করাকে সমর্থন করেন। পুরুষ এবং নারী উত্তরদাতা বিভিন্ন কারনে আসন সংখ্যা ৪৫ করাকে সমর্থন করেন না। এর মধ্যে রয়েছে-

- নারী জনসংখ্যার অণুপাতে আসন সংখ্যা অপর্যাপ্ত
- সমগ্র আসনের ১/৩ অংশ অর্থাৎ সংরক্ষিত নারী আসন ১০০ হতে হবে
- অন্যান্য দেশকে অনুসরণ করে সংরক্ষিত আসনের নীতিমালা করা হলেও যেখানে অন্যান্য দেশে এই অনুপাত এক তৃতীয়াংশ, সেখানে বাংলাদেশে এটা কম।

n =100

নারী (৬০)		পুরুষ (৪০)	
সমর্থন করেন/হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	সমর্থন করেন না/না
২১.৬৭ (১৩)	৭৮.৩৩ (৪৭)	৭২.৫ (২৯)	২৭.৫ (১১)

Dhaka University Institutional Repository

৬.৮ সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে অভিমত

বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৩৪৫টি। এর মধ্যে ৩০০ আসনে নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে সাংসদেরা নির্বাচিত হন। বাকি ৪৫টি সংরক্ষিত আসনে নারী সাংসদেরা নির্বাচিত হন নির্বাচিত সাধারন এম.পিদের ভোটে। এর ফলে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধান্য থাকে সংরক্ষিত নারী আসনগুলিতে। এই ৪৫ জন নারীকে জনপ্রতিনিধি বলা হলেও মূলতঃ তারা জনগণের প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত নন। সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্নমূখী আলোচনা চলছে। গবেষণায় উঠে আসা মতামত থেকে দেখা যায় যে, মোট নারী উত্তরদাতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৮৫%) মনে করেন যে, সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন হওয়া উচিত এলাকার সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে। তবে তাদের মধ্যে ১১.৬৭% মনে করেন যে, নির্বাচন হওয়া উচিত নির্বাচনী এলাকায় থাকা কেবলমাত্র নারীদের ভোটে। অন্যদিকে মোট পুরুষ উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বেশি (৫৭.৫%) মনে করেন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন হওয়া উচিত সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে। তাছাড়া পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৮.৩৩%) মনে করেন যে, নির্বাচন হওয়া উচিত সংসদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে।

n=100

নারী (৬০)					পুরুষ (৪০)				
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৮৫.০ (৫১)	১১.৬৭ (৭)	০.১৭ (১)	০.১৭ (১)	০.০ (০)	৫৭.৫ (২৩)	৫.০ (২)	১৮.৩৩ (১১)	১০.০ (৪)	০.০ (০)

সূত্র- সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে

৬.৯ নারী সাংসদ হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলিক যোগ্যতা

একজন নারী সাংসদের সাংসদ হওয়ার ক্ষেত্রে কতক মৌলিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। নারী ও পুরুষকে এ প্রশ্ন করা হলে তারা বিভিন্নজন বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে উভয়ই যেসকল অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেগুলো হলো-

১. মাঠ পর্যায়ে রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে
২. ন্যূনতম স্নাতক পাশ হতে হবে
৩. কোনরুপ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত নয়।
৪. এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে দীর্ঘকালীন সম্পৃক্ততা থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬.৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন নারী সাংসদ হতে হলে মাঠ পর্যায়ে তাদের অবশ্যই সংশ্লিষ্টতা থাক তে হবে। কেননা মাঠপর্যায়ে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা না াকলে তারা জনগণের দু:খ কষ্ট উপলব্ধি করতে পারবে না।তবে এক্ষেত্রে নারী উত্তরদাতারা পুরুষদের তুলনায় বেশি জোড় দিয়েছে।দ্বিতীয় যে বিষয়টির উপর তারা গুরুত্বারোপ করেন তা হলো ন্যুনতম স্নাতক পাশ হতে হবে।এছাড়া মাত্র ১৬.৬৬ শতাংশ পুরুষ দুর্নীতি মুক্ত মামলা মুক্ত হওয়ার কথা বলেন।

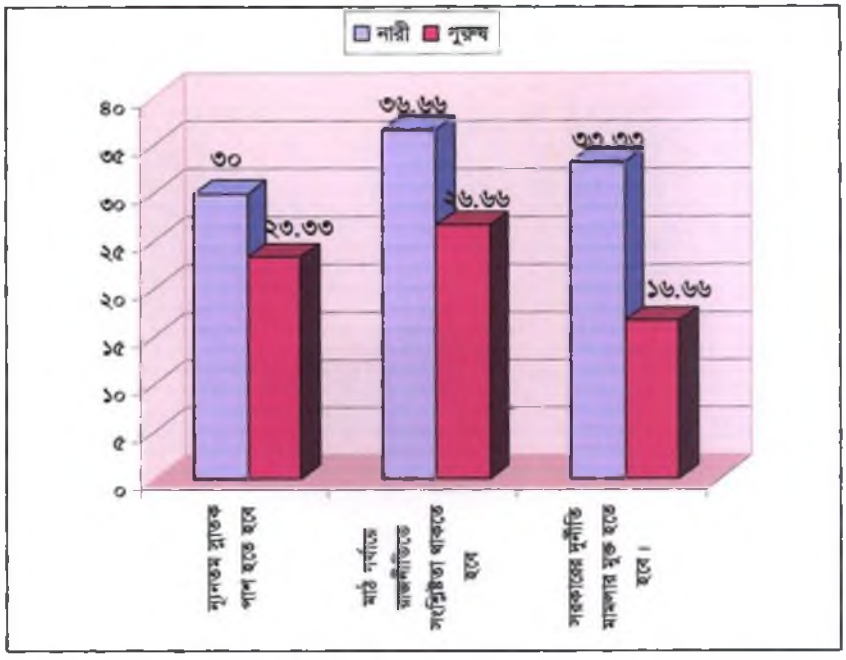

৬.১০ নারী স্বার্থ ও নারী বিষয়ঃ

নারী সাংসদরা কতটুকু নারী স্বার্থ রক্ষার্থে সচেষ্ট এরূপ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতারা নারী সাংসদদের প্রকৃত অবদানের কথা তুলে ধরেন। নারী সম্প্রদায়ের স্বার্থের ক্ষেত্রে তারা কতটা গুরুত্ব দেন এ প্রশ্নে ৮৫.৯৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দেন, ১০.০৪ শতাংশ মনে করেন তারা নারী বিষয়সমূহে সচরাচর গুরুত্ব প্রদান করেন। কেউই এই বিষয়টা স্বীকার করে না যে, নারী স্বর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি একেবারে গুরুত্ব পায়নি।

সাধারণত সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যরা উচ্চবিত্ত পরিবারের এবং তারা শহরে বাস করে। একটা সাধারণ বিষয় থেকে যায় যে, তারা দরিদ্রদের দৈনন্দিন সমস্যা সম্পর্কে অবগত নয়। সাধারণ নারীদের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়ার মাত্রা সম্পর্কে জানার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন প্রশ্নমালায় সংযুক্ত করা হয়। দেখা গেছে জনগণ বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছে। ৪৩.৮৬ শতাংশ উত্তরদাতা সাধারণ নারীদের প্রধান সমস্যা হিসেবে অর্থনৈতিক পরাধীনতার কথা তুলে ধরেছেন। ২২.৮০ শতাংশ আবার শিক্ষার পশ্চাদপদতাকে

Dhaka University Institutional Repository

দায়ী করেছেন। ২১.০৬ শতাংশ মৌলবাদী রাজনীতির কথা উল্লেখ করেছেন। ১০.৫৩ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কথা বলেছেন।

এটা লক্ষ্য করা যায় যে, উত্তরদাতাদের বেশীরভাগই উল্লেখ করেছেন যে, তারা নারী স্বার্থকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। নারীরা অর্থনৈতিক সাহায্যের মতো সাধারণ অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬.১১ সংরক্ষিত নারী সাংসদদের নির্দিষ্ট এলাকা থাকা প্রয়োজন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী আসন বিষয়ে এক বিতর্ক অনেক দিনের । নারীর সাধারণ ও সংরক্ষিত আসন এই দুই বিষয় নিয়ে আজও ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা চালু থাকলেও নারী সাংসদ মনোনয়নের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি বিতর্ক চলছে। নারী সাংসদদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্দিষ্ট থাকা উচিত কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তর দাতারা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছে। তারা মনে করেন নারী সাংসদ যেহেতু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হয় তাই তারা কোন সুনির্দিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়। আবার কোন সুনির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া সঠিকভাবে তারা কোন কার্যকর কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে পারে না। এমতাবস্থায় উত্তরদাতাদের মধ্যে বিভিন্ন মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ নারীর জন্য নির্দিষ্ট এলাকা থাকা বাঞ্চনীয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং ২০ শতাংশ এক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা মনে করেন সংরক্ষিত আসনে যেহেতু জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই; তাই তাদের সুনির্দিষ্ট কোন এলাকার প্রতিনিধিত্ব করা উচিত নয়। অন্যদিকে ৯০ শতাংশ মনে করেন নারীদের সত্যিকার উন্নতির লক্ষে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদদের অবশ্যই সুনির্দিষ্ট এলাকা থাকতে হবে। কেননা সংশ্লিষ্ট সাংসদ খুব ভাল মতো তার নিজের এলাকা সম্পর্কে অবগত থাকেন। তার এলাকার সমস্যাগুলো তিনি ভাল মতো উপলব্ধি করে সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারেন।এছাড়াও এলাকাওয়ারী অনুদান ও অর্থ বরাদ্দ থাকে যা থেকে সংরক্ষিত আসনের সাংসদরা বঞ্চিত হন। ১০ শতাংশ নারী উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন।

৬.১২ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সাংসদ ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সাংসদদের বেতনভাতা ও সুবিধাদি

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীরা দুইভাবে নির্বাচিত হন। সাধারণ আসনে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের ভোটে এবং সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষভাবে সাংসদদের ভোটে। প্রশ করা হয়েছিলো এই দুই ধরনের নারী সাংসদের বেতনভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে। উভয় ধরণের নারী সাংসদের বেতন কাঠামোর ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে জনগণের মতামত জানতে চাইলে ৯০ ভাগ পুরুষ এই মত প্রদান করেন যে যেসব নারী সাংসদ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের অবশ্যই জনপ্রিয়তা আছে এবং তারা জনগণের সেবামূলক কর্মকাণ্ড নিজস্ব গুনের ফলে সাংসদ হতে পেরেছেন। আর সংশ্লিষ্ট আসনে যেসব নারী সাংসদ হয়েছেন তাদের জনগণের সেবার সুযোগ কম এবং তারা দলের অভিভাবকত্বে এ পর্যায়ে এসেছে। এক্ষেত্রে উভয়ের বেতন কাঠামো সমান হওয়া উচিত নয়। সাধারণ আসনের নারীদের বেতন কাঠামো অনেক বেশী হওয়া উচিত। ১০ শতাংশ পুরুষ সমান বেতন কাঠামের কথা বলেছেন নারী সাংসদের সম্মানের কথা বিবেচনা করে। তবে এক্ষেত্রে নারীদের মতামত চাইলে তারা বেশির ভাগই ৯৫ ভাগই বেতন কাঠামো সমান করার পক্ষপাতী নয়। ৫ শতাংশ পক্ষপাতী।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা গত প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশের নারীকে শাসন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে সমাজ ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। ফলে নারী যেমন তার নিজ অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হয়েছে তেমনি অবস্থানগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বাংলাদেশের নারীর অবস্থান এখনও প্রান্তিক। নারীর এই প্রান্তিকতা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই। রাষ্ট্রীয় নীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় আইন অনুযায়ী যেমন নারীকে কম অধিকার দেওয়া হয়েছে তেমনি পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক গঠন প্রক্রিয়ায় পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের কারণে নারীর অধস্তনতা বিরাজ করছে। তদুপরি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সম্পদের অসম বন্টন, মানব অধিকার লঙ্ঘন ও আইনের অনুশাসনের অভাব প্রভৃতি কারণেও নারী রাষ্ট্রের শাসন ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়।

প্রকৃত অর্থে নারীর স্বাধীনতা বা উন্নয়ন সেই দেশের সুষ্ঠু শাসন প্রক্রিয়ার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নীতির মাধ্যমে নারীকে যে অধিকার বা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নারীর উন্নয়ন নিশ্চিত করে। ফলে 'গুড গভর্ন্যান্স' বা সুশাসনের বিভিন্ন উপকরণসমূহ বাংলাদেশে কতটুকু কার্যকর তার উপরই নির্ভর করে বাংলাদেশের শাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান। সুশাসন কায়েম না হলে রাষ্ট্রের মতাদর্শ ও নীতিমালার সাথে বাস্তবতার বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল পদক্ষেপ বা উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

রাজনীতিতে নারীর সংখ্যা ভিত্তিক অবস্থান বৃদ্ধি ও সংহতকরণ সম্পর্কে যে প্রশ্নটি সচরাচর ওঠে তা হলো এই যে, সংখ্যা বৃদ্ধি ও অবস্থান সংহত হলেই কি স্বতঃসিদ্ধভাবে নারীর সমস্যা বা ইস্যু রাজনীতির অঙ্গনে দৃশ্যমান হবে? অর্থাৎ, নারীর সমস্যা বা জেন্ডার কনসার্ন কি রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে প্রাধান্য পাবেঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চেতনা বা প্রতিনিধিত্বের সংযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে, বলা হয়ে থাকে যে অধিক হারে নারী যখন রাজনীতির অঙ্গনে অংশগ্রহণ করেন, তখন প্রক্রিয়াগতভাবেই তাঁরা নারীর সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন, যদি তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে তৃণমূলের সম্পৃক্তি থাকে। বৃহত্তরক্ষেত্রে, নারীর সমস্যাকে প্রান্তিক ও ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে কেন্দ্রিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতা ধারণ করেন রাজনৈতিক দল ও নারী সংগঠন।

সমাজে নারী-পুরুষের সমতার আদর্শের প্রতি রাজনৈতিক দলের অবস্থান ও কমিটমেন্টের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন ভাবে ঘটতে পারে উদাহরণস্বরূপ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোর উল্লেখ করা যেতে পারে। জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠি নারী বিভিন্নভাবে সমাজ কাঠামোয় পশ্চাদপদ এবং অসম অবস্থানে

Dhaka University Institutional Repository

বিরাজ করছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে- যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আইনগত অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু তা কোনও দলীয় ইশতেহারেই প্রতিফলিত হয় নি।

নারীর প্রতি বৈষম্য অপনোদন ও নারী উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার রাজনৈতিক দলগুলিকে ব্যক্ত করতে হবে, জাতীয় উন্নয়ন নীতি ও দলীয় আদর্শের উপাদান হিসেবে। এর পরিপূরক হিসেবে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে নারীকে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কাঠামোয় প্রয়োজন বোধে 'কোটা' ভিত্তিতে তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে যেখানে জেন্ডার ইস্যু রাজনৈতিক দলের প্লাটফর্মে বলিষ্ঠভাবে এসেছে, সেখানে দেখা গেছে রাজনৈতিক দল 'কোটা' নির্ধারণের মাধ্যমে বা বিশেষ ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি জোরদার করেছে। অবশ্য 'কোটা'র সমালোচনা এভাবে করা হয় যে কোটা পদ্ধতি অণুসৃত হলে তা পরিণামে সর্বোচ্চ সিলিং বেঁধে দেয় যেটা স্টাটিক হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তবু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ ধরণে কৌশল বাঞ্ছনীয় হবে বলে আশা করা হয়। রাজনৈতিক দলের মহিলা অংগ সংগঠনের শাখার কর্মকাণ্ড নারী অধিকার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাঝে বিস্তৃতি ঘটিয়ে সচেতনতা ও সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। মূল দলের এজেন্ডায় নারী সমাজের স্বার্থের সংযোজন ও অন্তর্ভুক্তিতে তাঁদের গুরুত্ববহ মেডিয়েটিং ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশে সাধারণতঃ নারী সংগঠনগুলি নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। নারী ও সমাজের সচেতনতা সৃষ্টি, নারীকে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে তোলা, বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্যের দূরীকরণ- সার্বিকভাবে বলা যায় আদর্শগত ও কর্মপদ্ধতিগত ভিন্নতা সত্ত্বেও, এগুলোই নারী সংগঠনের মূল লক্ষ্য ।কখনও সংগঠনগুলি জনমত সৃষ্টি বা সমর্থন মোবিলাইজেশনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুকূল মতামত তৈরীর প্রয়াস নেয়। সাধারণতঃ নারী সংগঠনের মূল ধারা এই খাতেই প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন দেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে, সংগঠনগুলির গতিময়তা, সামর্থ ও ব্যাপ্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোথাও বা নারী সংগঠনগুলির কার্যক্রম আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

নারী সংগঠনগুলি সাধারণতঃ নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবী করে। (অবশ্য, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এমন নারী সংগঠনও রয়েছে।) মূলতঃ সংগঠনগুলি নারী অধিকার ও সমতা আদায়ের লক্ষ্যে নিয়োজিত এবং এদিক থেকে তাদের লক্ষ্যের রাজনৈতিক মাত্রা অবশ্যই রয়েছে। নারী সংগঠনগুলি তৃণমূল পর্যায়ে সম্পৃক্ত বা বিস্তৃত এবং নারী সমাজকে মোবিলাইজ করার ক্ষমতা ধারণ করে। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিভাবে নারী সংগঠন ও মহিলা রাজনীতিবিদের মধ্যে সংযোগ অব্যাহত রাখা যায়, যার ফলে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে চিহ্নিত নারী সমাজের দাবী রাজনীতির অঙ্গনেও প্রতিভাত হবার সম্ভাবনা থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ নারী সংগঠনগুলি দলমত নির্বিশেষে নারী সমাজের মুখপাত্র। রাজনীতির অঙ্গনে এই গ্রহণযোগ্যতা ও সম্ভাব্য কার্যকারিতার জন্য তাদের যথার্থই নির্দলীয় ভূমিকা নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত সংগঠনকে দল নির্বিশেষে নির্বাচনে অবতীর্ণ মহিলা প্রার্থীদের, কিছু মৌলিক ইস্যুর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধতার ভিত্তিতে, সমর্থন জ্ঞাপন এবং এই সমর্থন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকায় বিস্তৃত করা যায় কি না, এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। চিন্তাভাবনা করতে হবে পার্টিসান রাজনীতি বা দল-ঘেষা রাজনীতির উর্ধ্বে কিভাবে রাজনীতিতে অবতীর্ণ নারীর শক্তি বৃদ্ধি করা যায় এবং নারীর স্বার্থ সংক্রান্ত ইস্যুগুলিকে রাজনৈতিক অঙ্গনের দিকে ধাবিত করা যায়। বাংলাদেশের চলমান রাজনীতির ধারায় কোন কোন নারী সংগঠনের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে যে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি তোলা যায়, সেটি হলো এই যে প্রদত্ত সমর্থন নারী অধিকার অর্জনের ঈপ্সিত লক্ষ্যকে অগ্রবর্তী করেছে কি না। অর্থাৎ, যে মঞ্চ নারী সংগঠনের উপস্থিতির ভিত্তিতে সমাজে বৃহত্তর প্রতিনিধিত্বের দাবী রাখতে সক্ষম হচ্ছে, সেই মঞ্চ থেকে নারী ইস্যু বা এজেন্ডা উচ্চারিত হচ্ছে কি না।

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়ে অত্যন্ত অপ্রতুল হারে প্রতিনিধিত্বের ফলে নারীর সমতা ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত পাবলিক পলিসি সম্পর্কিত সমস্ত সিদ্ধান্ত পুরুষের এখতিয়ারে রয়ে যায়, যাদের এ ধরণের বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরূপ আগ্রহ না-ও থাকতে পারে।(উইমেন,২০০০) । নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, প্রথমতঃ গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন-নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্তে ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রীয়গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান । তৃতীয়তঃ যুক্তি নারী-পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকেবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। চতুর্থতঃ নারীর সবল সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা, নারীর জীবন ও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতাবহির্ভূত বলে বিবেচিত, সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচিত হবে। সবশেষে, দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সাম্প্রতিককালে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলের নির্বাহী কর্মকর্তা পদে এক-তৃতীয়াংশ নারী নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। সংসদে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে নিবন্ধনে ইচ্ছুক প্রত্যেকটি

Dhaka University Institutional Repository

দলের মনোনয়নের একটি নির্দিষ্ট অংশ (শুরুতে অন্তত ২০ ভাগ) নারীদের জন্য বরাদ্দ করার লিখিত অঙ্গীকার নেয়ার প্রস্তব করা হয়েছে। এছাড়া সংসদের মোট আসনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ প্রত্যক্ষ ভোটে এবং এক-তৃতীয়াংশ প্রতিটি দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে পরোক্ষভাবে নির্বাচন করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো এসব প্রস্তাব মেনে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয়েছে। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তার ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এবারই প্রথম উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ীও হন যা স্বাধীনতার পর সর্বাধিক।

যেহেতু রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি পরস্পর সম্পৃক্ত, সেহেতু রাজনীতিতে নারীর অবস্থান সংগঠিত ও সুসংহত করার উদ্দেশ্যে এবং নারীর সমস্যাকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিভাত ও নারী-পুরুষ সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে, নিম্নে কিছু সুপারিশ উপস্থাপিত হলোঃ

১। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে মনোনয়নের কোটা নূন্যতম সংখ্যা (শতকরা ১৫-২০) নির্ধারণ করতে হবে।

২। রাজনৈতিক দলের মূলনীতি, কর্মসূচী ও ইশতেহারে নারী অধিকার ও সমতা সংক্রান্ত দাবী দাওয়া সন্নিবেশিত হতে হবে এবং সম্ভব হলে খাতওয়ারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমস্যা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা বা নিরসনের দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

৩। রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং এর উপরিস্তর বা হায়ারআর্কিতে যথেষ্ট সংখ্যক নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোটা বা ন্যূনতম সংখ্যা নিরূপন করতে হবে।

৪। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে নারীর অবস্থান ও ইস্যু সংহতকরণের উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে মহিলা রাজনীতিকদের ফোকাস বা ছোট ইনফরমাল গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে জোরদার ও অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৫। যেহেতু নারীর আর্থিক শক্তি ও সম্পদ সীমিত, সেহেতু রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে মনোনীত মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারকার্যে আর্থিক ও সাংগঠনিক সহায়তা দান করবে।

৬। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্টকরণের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুপারিশ করা হোক।

৭। সংসদের আওতাভুক্ত কার্যক্রমে নারী প্রেক্ষিত যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে কি না, তা মনিটর করা বা নজর রাখার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বা পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন ইস্যুজ গঠন করা হোক।

৮। সংসদের অভ্যন্তরে এবং স্ব স্ব সংসদীয় দলে নারীর স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন, সমর্থনজ্ঞাপন ও সমর্থন আদায়ের জন্য দলীয় রাজনীতি ও স্বার্থের উর্ধ্বে মহিলা সাংসদ কর্তৃক সর্বদলীয় সংহতি গ্রুপ গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হোক।

৯। মন্ত্রী পরিষদে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ বৃদ্ধি করা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

১০। নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর প্রার্থীতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনকে নির্দলীয় রূপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং নারী স্বার্থ সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধতার ভিত্তিতে নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারকার্যে সর্বতো সাহায্য প্রদান করতে হবে।

১১। রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখা নারী অধিকার ও নারী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির মাধ্যমে নারী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও মোবিলাইজ করতে, সমর্থনের ভিত তৈরী করতে এবং নারীর রাজনৈতিক ভূমিকার প্রতি ইতিবাচক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবে।

১২। নারী রাজনীতিক ও নারী সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে।

১৩। রাজনীতিতে নারীর আগমনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ ও অস্ত্রের রাজনীতির উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে।

১৪। নারীর শিক্ষা ও পেশাগত সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ও প্রবেশের পথ সুগম করতে হবে।

১৫। শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যম মারফত নারীর ব্যক্তিত্ব, অবদান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করতে হবে।

১৬। শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যম মারফত পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও কার্যক্রমের দিকে প্রণোদিত করতে হবে এবং সমাজে উপযুক্ত ও ইতিবাচক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।

১৭। সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে নিয়োগ দান করে নারীকে সমাজে নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে সমাজে অনুকরণীয় রোল মডেল তৈরী হয় এবং নারীর নেতৃত্বমূলক কর্মক্ষেত্রে (যথা রাজনীতিতে) প্রবেশের আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

১৮। নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রসমূহে নারীকে সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদে, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহে অধিক সংখ্যক মহিলাকে নিয়োগ করার জন্য সকল পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে;

১৯। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদকে পূর্ণস্বীকৃতি দিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ সকল মহল থেকে গ্রহণ করতে হবে;

২০। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীকে পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন এবং অভিন্ন সিভিল কোড প্রবর্তন করতে হবে;

২১। রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলাদের আর্থিক সহায়তাদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে প্রতিটি দলের মহিলাদের সুসংগঠিত হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

২২। সকল নেতৃত্বদানের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে (স্থানীয় ও জাতীয়) মহিলাদেরকে নেতৃত্ববিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার ও নেতৃস্থানীয় মহিলাদের এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে;

২৩। পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন আনার জন্য এবং নারীকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও কার্যক্রমের দিকে প্রণোদিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রচার মাধ্যমকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে হবে;

২৪। স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষাক্রমে নারীর রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

২৫। সংসদের আওতাভুক্ত কার্যক্রমে নারী প্রেক্ষিত যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে কিনা তা মনিটর করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে;

২৬। সংসদের অভ্যন্তরে ও স্ব স্ব সংসদীয় দলে নারীর স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় উপস্থাপন, সমর্থন জ্ঞাপন ও সমর্থন আদায়ের জন্য দলীয় রাজনীতি ও স্বার্থের উর্ধ্বে মহিলা সাংসদ কর্তৃক সর্বদলীয় সংহতি গ্রুপ গঠন করতে হবে;

২৭। নারী রাজনীতিক ও নারী সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নারীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে। উদ্দেশ্য একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় মহিলা ফোরাম গঠন করতে হবে;

২৮। দেশে বিরাজমান রাজনীতিকে সুস্থ করার লক্ষ্যে এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ ও অস্ত্রের ব্যবহারের ওপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে। নির্বাচনী ব্যয় সীমিত করতে হবে এবং সন্ত্রাস দমন করতে হবে;

২৯। রাজনৈতিক অঙ্গনে ও সার্বিক সামাজিক পরিসরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে;

৩০। মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা নারীর অধিকারকে খর্ব করে বিধায় এ ধরণের ধ্যান-ধারণা এবং নারীর অবস্থান ও অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মকে অপব্যবহার করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে;

৩১। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে গবেষণা জোরদার করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নারী সংগঠনকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি পর্যায়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে;

৩২। সরকারি পর্যায়ে গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

গ্রন্থপঞ্জি

১. মহাম্মদ,আনু,নারী পুরুষ ও সমাজ,সন্দেশ,ঢাকা ১৯৯৭,পৃ ৩১ ।

২. আজাদ,হুমায়ুন;নারী, আগামী প্রকাশনী,ঢাকা ১৯৯৩ পৃ ২৪

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান।

৪. চৌধুরী নাজমা, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন, প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা" ঢাকা ১৯৯৪.

৫. চৌধুরী,নাজমা ও বেগম হামিদা আক্তার,(সমন্বয়কারী) নারী ও উন্নয়ন:প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান,উইমেন ফর উইমেন,১৯৯৫,পৃ ১২৮-১২৯

৬. হোসাইন ,নাসিমা আখতার, "নারীদের অধস্তনতা ও বাংলাদেশের সমাজ " সমাজ নিরীক্ষণ সংখ্যা-২২,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা, ১৯৮৭ ।

৭. নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫।

৮. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা,প্লানিং কমিশন বাংলাদেশ সরকার।

৯. আকতার ,ফরিদা,সংরক্ষিত আসন:সরাসরি নির্বাচন,নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা,ঢাকা ।

১০. জাহাঙ্গীর ,বোরহানউদ্দীন খান " গ্রামীণ রাজনীতি ও নারী সমাজ" সমাজ নিরীক্ষণ সংখ্যা-২০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা,১৯৮৬ ।

১১. চৌধুরী ,ফারাহ দীবা, বাল্য বিবাহের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, গ্রামীণ ট্রাস্ট, ১৯৯৫, পৃ.৮।

১২. ভোরের কাগজ, ২০ জুলাই, ১৯৯৭

১৩. ভোরের কাগজ, জুন ১৮, ১৯৯৯।

১৪. মণ্ডল গৌতম, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে হতাশাব্যাঞ্জক প্রধান বাধা রাজনৈতিক দল, নিউজ নেটওয়ার্ক ২০০৩.

১৫. গুহঠাকুরতা,মেঘনা ও বেগম ,সুরাইয়া "রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন:প্রসঙ্গ বাংলাদেশ সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা-৬২,নভেম্বর ১৯৯৬।

১৬. বেগম ,মালেকা, "নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ", নারী: রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, সম্পাদিত, সমাজ নীরিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.১০০।

১৭. ভূইয়া ,রাবিয়া, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ মুসলিম নারীর আইনগত অধিকার, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৮৬, পৃ.১।

১৮. রহমান ,শাহীন,"নারীবাদ:একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা" উন্নয়ন পদক্ষেপ,চতুর্থ বর্ষ,দ্বাদশ সংখ্যা,এপ্রিল-জুন,১৯৯৮,স্টেপস টুয়ার্ডস ডেবলপমেন্ট ।

Dhaka University Institutional Repository

1. Jahan, Rounaq. "Bangladeshi women facing 21st century" paper presented in a seminar of BIISS, Dhaka 1995.
2. Afsar, Rita, "mainstreaming women development plans: A Few critical comments on the fifth Five year plan" in Empowerment ,A journal of women for women Vol 4,1997,pp 105.
3. Ahmed ,N. 'In search of Institutionalization :Parliament of Bangladesh',JOurnal of Legislative Studies 4 (4),1998.
4. Amin,Asha Mehrin "Why so mrginalized"The daily Star Magazine,May 31,1996.
5. Annual report: 1997-98,ADAB.
6. Choudhury, Dilara and Hasanuzzaman, Al Masud "Political decision making in Bangladesh and the role of Women"Asian Profile,vol 25,No 1,Feb 1997.
7. Choudhury N. 'bangladesh :Gender issues and politics in a patriarchy'in B.J nelson and N Choudhury (eds) Women and Politics Worlwide ,Yale University Press, London,1994.
8. Choudhury, Nazma (ed) Women and politics world wide ,yale University press,1994.
9. Choudhury,D "Women's Participation in the formal structure and Decision Making Bodies in Bangladesh',In R Jahan (ed),Empowerment of Women :Nairobi to Beijing (1985-1995),Women for Women:A research and Study group,Dhaka,1995.
10. Choudhury,D.The politics of women's representation in the national legislature.Accessesed 30 september ,2000.
11. Choudhury,Dilara.Constitutional Development in Bangladesh:Stresses and strains ,Oxford University Press,Karachi 1974.

Dhaka University Institutional Repository

12. Dahlerup,D. 'Using quotas to increase women's political representation .in aA Karam(ed),women in parliament :Beyond numbers ,IDEA,Stockholm,1998
13. Del M and C.Feijoo 'Democratic Participation and Women in Argentina',The jop Hopkins University Press London,1998
14. Friedmann,J.Empowerment:The politics of alternative Development, Blackwell Publishers,London.
15. Giddens, Anthony, Essentials of sociology, Norton 2006.
16. Gramsci,A. Prison notebooks ,International Publishers,NY,1971.
17. Hasanuzzaman,Al Masud and Hussain,Nassema "Women in legislatures in Bangladesh"in Asian Studies –A journal of Department of Government and Politics No 8,June 1994,pp 82-85.
18. Hussain Naseema and Khan S "Culture and politics in Bangladesh:Some reflections"paper presented in Social Science , Faculty Seminar ju 1996.
19. Hussain,Nassema,, A,Social relationship politics and role of women" Asian Studies,No 12,1993.
20. Inter-Parliamentary Union, Distribution of Seats Between and Women in National Assemblies (Geneva, 1987).
21. Inter-Parliamentary Union, Participation of Women in Political LIfe and in the Decison Making Precess (GEneva, 1988), pp. 5-6.
22. Jahan ,Rounaq and Papenak, H (eds), Women and Development Perspectives from South and South-east Asia BILLA, Dhaka 1979.
23. Jahan, Rounaq,The Elusive Agenda Mainstreaming Women in Development UPL Dhaka 1995.
24. Jahan ,Rounaq. "Purdha and participation":Women in the politics of Bangladesh"in Hanna Papanek and Gail Minault (eds,) Separate world :Studies of Purdah in South Asia ,Chanakya publications,New Delhi,1981.

Dhaka University Institutional Repository

25. Jahan,R.The Elusive Agenda :Mainstreaming Women in Development.London,Zed Books,1995.
26. Huq ,Jahanara et.al. Beijing Process and Follow-up, Bangladesh Perspective. Women for Women, 1997, p. 14-16.
27. Jahangir, B.K. Violence and consent in a Peasant Society and other essays,DU 1990.
28. Kotalova, Jitka, Belonging to Others Cultural Construction of Womenhood in a Village in Bangladesh, The Unviersity Press Limited, Dhaka, 1996, p. 190.
29. Aziz ,K.M. Ashraful and Maloney, Clarence, Life Stages, Gender and Fertility in Bangladesh, ICDDRB, 1985, pp. 55-56.
30. Karlekar, M.Voices from within:early personal narratives of Bengali women,Oxford,Oxford University Press,1991.
31. Kate Millet, Sexual politics, Garden city,Double Day,Newyork 1970.
32. Kenworthy, Lane and Malami, Mellisa, 1999, "Gender inequality in political representation. A worldwide comparative analysis" Social Focus, Vol. 78, No. 1.
33. Khan,M. Direct Election for Women MPs .Accesessed 26 July. 2000.
34. Lijphart,A. Patterns of Democracy:government Forms and Performance in Thirty six countries.London,Yale University Press,1999
35. Gandhi ,M K,Young India ,India Ganesan Triplicane,1922,PP,105-106
36. Piercy ,Marge,Women on the edge of time,Faweett,New York,1978.
37. Chen ,Marty "conceptual model for women's empowerment"Draft, April 1993.

Dhaka University Institutional Repository

38. Moniq Wittig, "One is not born a woman" in the second sex thirty years later: A commemoration conference of feminist Theory,mimeographed ,Institute for the Humanities,New York 1979.
39. Moser C, Gender Planning and Development theory Practice and Training, London: Routledge.
40. N, Owen, "Textile displacement and the status of women in South East Asia" Special reserve, Macquarie University, Sydney, Australia, 1978.
41. Chowdhury ,Najma, 'Bangladesh: Gender Issues and Politics in a pateriarchy, in Nelson and Chwdhury ed., *Women and Politics*.
42. Chowdhury ,Najma, "Bangladesh: GEnder Issues and Politics in a Patriarchy". Women and Politics: Worldwide ed., Barbara Nelson & Najma Chowdhury, Oxford University Press, 1997, p.94.
43. Naseema ,A, Hussain .Politics and political participation in a Bangladesh Village"unpublished M. phil thesis,Rajshahi University.
44. Paterman C, "Feminism and Democracy in Pateman C, Disorder of women,polity Press,Cambridge,1990.
45. Philips, Ann, "Must Feminists Give up on Liberal Democracy" in Held , Prospects for Democracy,Blackwell publishers,London.
46. Bourdieu, Pierre, Outline of a theory of practice, Cambridge, University press, ^ambridge, 1977.
47. Price, J.Women's Development :Welfare Project or Political empowerment , Amsterdam conference Mimeo.
48. Rowlands,J,Questioning Empowerment working with Women in hondarances:UK Oxfam,1997.
49. Khan ,Salma,.The Fifty Percent:Women in Development and Policy in bangladesh,The University Press limited,Dhaka,1993,P-106

Dhaka University Institutional Repository

50. Sobhan, Rehman, Planning and public Action for Asian Women,1992,pp 25-33

51. Statistical Pocketbook of Bangladesh 1996,published in January 1997,p27.

52. Statistical Yearbook of Bangladesh, 1997.

53. Statistical Yearbook of Bangladesh, 1997.

54. Kaushik ,Sushila, 'Women, Women's Issues and Ninth General Elections' in C.P. Bhambri *et al* ed; *Teaching Politics, Special Issue on Ninth Lok Sabha Elections-Some Inter-pretations*, vol. xv, pp. 108-115.

55. Sylvia,Federici,Wages Against Housework,Falling Wall Press,Bristol 1973, Wally Secombe "The Housewife and Her labor Under capitalism" New Left Review,No,83,1974.

56. The Constitution (Tenth Amendment) Act, 1990 *Bangladesh Gazette Extraordinary*, 23 June 1990.

57. The Daily Star, May, 24, 1999.

58. The Daily Star,March,28,1998 and May 13,1999.

59. The Fifth Five Plan, 1997-2002. Planning Commission, Minsitry of Planing, Bangladesh, 1998, p. 176.

60. The Fifth Five Year Plan 1997-2002, cÖv¸³, c„. 167|

61. The Nairobi Forward- Looking Strategies for the Advancement of Women, United Nations, 1985.

62. Mandal ,Tirtha ,The Women Revolutionaries of Bengal :1905-1939,India –Minerva,1991,P-2

63. United Nations, *Women: Challenges to the Year-2000* (New York, 1991), p.32.

64. Universal declaration of Democracy cairo, 1997.

65. Women in Politics and Decision-Making in the late Twentieth Century,UNDP

66. Women in Politics and Decision-Making, p.10.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

প্রশ্নমালা

সেট-যমুনা-(১)

(নারী উত্তরদাতাদের জন্য প্রণীত)

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক পর্যালোচনা"বিষয়ক গবেষনা কর্মের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা

সাধারন তথ্যাবলী

ক. উত্তরদাতার নাম:
খ. বর্তমান ঠিকানা:
বয়স: শিক্ষা: পেশা/পদবী:

১.আপনি কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ সমর্থন করেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়,তবে কেন ?

২. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে?

৩. কিভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়?

৪. নাগরিক সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে কিভাবে নারীরা রাজনীতিতে এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিকায়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে? অনুগ্রহ করে পরামর্শ দিন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আপনি কি মনে করেন সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয় তবে কত সময় পর্যন্ত

ক. আরও ১০ বছর ☐

খ. আরো ১৫ বছর ☐

গ. আরো ২০ বছর ☐

ঘ. স্থায়ীভাবে ☐

ঙ. যদি কোন পরামর্শ থাকে ব্যক্ত করুন।

৬. গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন সংশোধনের সুযোগ ছিল না। আপনি কি মনে করেন আগামী সংসদ নির্বাচনে ঐ সংশোধনের জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

হ্যা ☐ না ☐

৭. সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা কত হওয়া উচিত?

ক. ৩০ ☐ খ. প্রতি জেলা থেকে ১ ☐

গ. ১০০ ☐ ঘ. ১৫০ ☐

যদি অন্য কোন পরামর্শ থাকে তবে অনুগ্রহ করে লিখুন।

৮. আপনার মতে সংরক্ষিত আসনে কিভাবে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন করা উচিত?

ক. পরোক্ষভাবে (সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে) ☐

খ. প্রত্যক্ষভাবে (নারী ও পুরুষ ভোটারদের মাধ্যমে) ☐

গ. প্রত্যক্ষভাবে (কেবলমাত্র নারী ভোটারদের মাধ্যমে) ☐

Dhaka University Institutional Repository

৯. আপনি কি মনে করেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত সাধারণ আসনে নির্বাচনের জন্য নারীদের বিশেষ কোটা থাকা উচিত?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, মনোনয়নের হার কত ?

ক. ১০ ভাগ ☐ খ. ২০ ভাগ ☐ গ. ৩০ ভাগ ☐

যদি আরও পরামর্শ থাকে, অনুগ্রহ করে লিখুন।

১০. আপনার মতে তৃনমূল পর্যায়ে কিভাবে নারীদের রাজনীতিতে আরোও সম্পৃক্ত করা যায়।

১১. বর্তমানে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাশ করে সংরক্ষিত নারী সাংসদের সংখ্যা ৪৫ করা হয়েছে, এটাকে আপনি সমর্থন করেন কি?

হ্যা ☐ না ☐

যদি না হয়,তবে কেন করেন না ?

১২. সংরক্ষিত নারী আসনে কিভাবে নির্বাচন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ক. নির্বাচনী এলাকায় সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে

খ. নির্বাচনী এলাকায় কেবলমাত্র নারীদের ভোটে

গ. সংসদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক হারে

ঘ. নির্বাচিত সাধারণ এম.পি-দের ভোটে

ঙ. অন্যান্য মতামত থাকলে উল্লেখ করুন

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আপনার মতে নারীদের সাংসদ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কি কি মৌলিক যোগ্যতা থাকা উচিত?

১৪. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন নারী সাংসদ কি কি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১৫. সংরক্ষিত নারী সাংসদদের নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন-এই বক্তব্যের পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিন

১৬. সাধারন আসনে নির্বাচিত সাংসদ ও সংরক্ষিত আসনের সাংসদদের**একই বেতনভাতা ও সুবিধাদি থাকা উচিত কিনা**- পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিন

১৭. অতীতে আপনার এলাকায় সংরক্ষিত নারী সাংসদের কোন কার্যালয় ছিল কি?

Dhaka University Institutional Repository

সেট-কপোভাক্ষ -(২)

(পুরুষ উত্তরদাতাদের জন্য প্রণীত)

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক পর্যালোচনা"বিষয়ক গবেষনা কর্মের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা

ক. উত্তরদাতার নাম:
খ. বর্তমান ঠিকানা:
বয়স: শিক্ষা: পেশা/পদবী:

১.আপনি কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ সমর্থন করেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, তবে কেন ?

২. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে?

৩. কিভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়?

৪. নাগরিক সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে কিভাবে নারীরা রাজনীতিতে এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিকায়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে? অনুগ্রহ করে পরামর্শ দিন।

৫. আপনি কি মনে করেন সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত?

হ্যা ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

যদি হ্যা হয় তবে কত সময় পর্যন্ত

ক. আরও ১০ বছর ☐

খ. আরো ১৫ বছর ☐

গ. আরো ২০ বছর ☐

ঘ. স্থায়ীভাবে ☐

ঙ. যদি কোন পরামর্শ থাকে ব্যক্ত করুন ☐

৬. গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন সংশোধনের সুযোগ ছিল না। আপনি কি মনে করেন আগামী সংসদ নির্বাচনে ঐ সংশোধনের জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

হ্যা ☐ না ☐

৭. সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা কত হওয়া উচিত?

ক. ৩০ টি ☐ খ. প্রতি জেলা থেকে ১টি ☐

গ. ১০০টি ☐ ঘ. ১৫০টি ☐

যদি অন্য কোন পরামর্শ থাকে তবে অনুগ্রহ করে লিখুন।

৮. আপনার মতে সংরক্ষিত আসনে কিভাবে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচন করা উচিত?

ক. পরোক্ষভাবে (সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে) ☐

খ. প্রত্যক্ষভাবে (নারী ও পুরুষ ভোটারদের মাধ্যমে) ☐

গ. প্রত্যক্ষভাবে (কেবলমাত্র নারী ভোটারদের মাধ্যমে) ☐

৯. আপনি কি মনে করেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত সাধারণ আসনে নির্বাচনের জন্য নারীদের বিশেষ কোটা থাকা উচিত?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, মনোনয়নের হার কত ?

Dhaka University Institutional Repository

ক. ১০ ভাগ ☐ খ. ২০ ভাগ☐ গ. ৩০ ভাগ ☐ ঘ.৩০ ভাগের বেশী ☐

যদি আরও পরামর্শ থাকে, অনুগ্রহ করে লিখুন।

১০. আপনার মতে তৃনমূল পর্যায়ে কিভাবে নারীদের রাজনীতিতে আরোও সম্পৃক্ত করা যায়।

১১. বর্তমানে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাশ করে সংরক্ষিত নারী এম.পি-র সংখ্যা ৪৫ করা হয়েছে, এটাকে আপনি সমর্থন করেন কি?

হ্যা ☐ না ☐

যদি না হয়,তবে কেন করেন না ?

১২. সংরক্ষিত নারী আসনে কিভাবে নির্বাচন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ক. নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে

খ. নির্বাচনী এলাকায় কেবলমাত্র নারীদের ভোটে

গ. সংসদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আনুপাতিক হারে

ঘ. নির্বাচিত সাধারণ এম.পি-দের ভোটে

ঙ. অন্যান্য মতামত থাকলে উল্লেখ করুন

১৩. আপনার মতে নারীদের সাংসদ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কি কি মৌলিক যোগ্যতা থাকা উচিত?

১৪. নারীর অধিকার প্রতিষঠার ক্ষেত্রে একজন নারী সাংসদ কি কি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১৫.সংরক্ষিত নারী সাংসদদের নির্বাচনী এলাকা নির্দিষট থাকা প্রয়োজন-এই বক্তব্যের পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিন

১৬.সাধারন আসনে নির্বাচিত সাংসদ ও সংরক্ষিত আসনের সাংসদদেও একই বেতনভাতা ও সুবিধাদি থাকা উচিত কিনা- পক্ষে/বিপক্ষে মতামত দিন

১৭. অতীতে আপনার এলাকায় সংরক্ষিত নারী সাংসদের কোন কার্যালয় ি

Dhaka University Institutional Repository

সেট মেঘনা

(সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারী সাংসদদের জন্য)

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন;বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক পর্যালোচনা"বিষয়ক গবেষনা কর্মের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা

ক. সাংসদের নাম:

খ.আসন সংখ্যা

গ. বর্তমান ঠিকানা:

বয়স: শিক্ষাগত যোগ্যতা: পেশা/পদবী:

১. কিভাবে আপনি সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হলেন?

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ☐ পরোক্ষ নির্বাচন ☐

কতবার প্রত্যক্ষ ☐বার, কতবার পরোক্ষ? ☐বার

২.আপনার রাজনীতিতে অংশগ্রহনের পেছনে কোন কারনটি উল্লেখযোগ্য

ক.পারিবারিক

খ.ছাত্ররাজনীতি

গ.অন্যান্য

৩. আপনার ছাত্র জীবনে আপনি কি কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, তবে অনুগ্রহ করে সংগঠনটির নাম বলুন।

৪. আপনি কি কোন ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

হ্যা ☐ না☐

৫. আপনি কি সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় আগে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন?

Dhaka University Institutional Repository

হ্যা ☐ না ☐

কোন পর্যায়ে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন

ক. থানা পর্যায়ে কোন পদে ☐

খ. জেলা পর্যায়ে কোন পদে ☐

গ. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কোন পদে ☐

৬. আপনি কি নিয়মিত সংসদ অধিবেশনে যোগ দেন? হ্যা ☐ না ☐

যদি নিয়মিত না হয়, তবে তার কারণ

৭. সংসদে কোন ধরনের আলোচনা আপনাকে বেশী আকৃষ্ট করে-

ক. .....

খ. .....

গ. .....

৮. নারীর প্রতিনিধি হিসেবে নারী স্বার্থকে কতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেন ?

ক. সবচেয়ে বেশি ☐ খ. সাধারণ ☐ গ. কোন গুরুত্ব নয় ☐

৯. বাংলাদেশের নারীরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়। আপনার এলাকার নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন।

১০. নারী অগ্রগতিতে আপনার উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ কি কি?

Dhaka University Institutional Repository

১১. নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বড় বড় বাধাগুলো কি কি?

ক. দলীয় চাপ ☐

খ. প্রশাসনের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা ☐

গ. পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ায় জনসমর্থনের

অভাব ☐

ঘ. অন্যান্য (দয়া করে উল্লেখ করুন) ☐

১২. আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত আসনের সাংসদগণ নারীর স্বার্থ রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে?

হ্যা ☐ না☐

যদি হ্যা হয়, তা উল্লেখ করুন।

১৩. আপনি কি সংসদে কোন বিল উপস্থাপন করেছেন?

হ্যা ☐ না☐

যদি করে থাকেন, আপনি বিলের টাইটেলটি উল্লেখ করুন।

১৪. আপনার বিলের বর্তমান অবস্থা কি ?

ক. বিলটি আইনে পরিণত হয়েছিল ☐

খ. বিশেষ কমিটির বিবেচনায় আছে ☐

গ. গৃহীত হয়নি

ঘ.অন্যান্য

১৫. কমিটি মেম্বার হিসেবে আপনি কি কোন বিলে কাজ করেছেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, তা উল্লেখ করুন।

১৬. আপনি কি.কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ?

Dhaka University Institutional Repository

১৭. আপনি কি কখনো আইন তৈরি প্রক্রিয়ায় নারী সদস্য হিসেবে আপনার ভূমিকা পালনে বিশেষ কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, তবে কি ধরণের বাঁধা,উল্লেখ করুন ।

ক. .....

খ. .....

গ. .....

১৮. সংসদীয় কমিটির আলোচনায় অংশগ্রহণকালে আপনার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয় কি না?

১৯. কোন সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে?

হ্যা ☐ না☐

যদি হ্যা হয়, কমিটির নামটি বলুন।

২০. আপনি কি কখনো কোন কমিটির চেয়ার পারসন হয়েছেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

যদি না হয়,তার কারণ উল্লেখ করুন

২১. সংসদীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালনে পুরুষ সহকর্মীর নিকট থেকে আপনি কতটা সহযোগিতা পান ?

খুব ভাল ☐ মোটামুটি ☐ সন্তোষজনক নয় ☐

২২. নারী সাংসদ সদস্য হিসাবে পুরুষ সাংসদদেও নিকট থেকে কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কি?

আপনার উত্তর যদি হ্যা হয়, তবে তা উল্লেখ করুন

Dhaka University Institutional Repository

সেট-পদ্মা

(সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত নারী সাংসদদের জন্য)

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক পর্যালোচনা"বিষয়ক গবেষনা কর্মের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা

ক. সাংসদের নাম:

খ.আসন সংখ্যা

গ. বর্তমান ঠিকানা:

বয়স: শিক্ষাগত যোগ্যতা: পেশা/পদবী:

১. কিভাবে আপনি সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হলেন?

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ☐ পরোক্ষ নির্বাচন ☐

কতবার প্রত্যক্ষ ☐বার, কতবার পরোক্ষ? ☐বার

২.আপনার রাজনীতিতে অংশগ্রহনের পেছনে কোন কারনটি উল্লেখযোগ্য

ক. পারিবারিক

খ. ছাত্ররাজনীতি

গ. অন্যান্য

৩. আপনার ছাত্র জীবনে আপনি কি কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, তবে অনুগ্রহ করে সংগঠনটির নাম বলুন।

৪. আপনি কি কোন ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

হ্যা ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

৫. আপনি কি সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার আগে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন?

হ্যা ☐ না ☐

কোন পর্যায়ে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন

ক. থানা পর্যায়ে ☐ কোন পদে

খ. জেলা পর্যায়ে ☐ কোন পদে

গ. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ☐ কোন পদে

৬. আপনি কি নিয়মিত সংসদ অধিবেশনে যোগ দেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি নিয়মিত না হয়, তবে তার কারণ

৭. সংসদে কোন ধরনের আলোচনা আপনাকে বেশী আকৃষ্ট করে-

ক.....

খ.....

গ.....

৮. নারীর প্রতিনিধি হিসেবে নারী স্বার্থকে কতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেন ?

ক. সবচেয়ে বেশি ☐ খ. সাধারণ ☐ গ. কোন গুরুত্ব নয় ☐

৯. বাংলাদেশের নারীরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়। আপনার এলাকায় নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন।

১০. নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে আপনার উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ কি কি?

Dhaka University Institutional Repository

১১. নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বড় বড় বাধাগুলো কি কি?

ক. দলীয় চাপ ☐

খ. প্রশাসনের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা ☐

গ. পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ায় জনসমর্থনের অভাব ☐

ঘ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ☐

১২. আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত আসনের সাংসদগণ নারীর স্বার্থ রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, তা উল্লেখ করু

১৩. আপনি কি সংসদে কোন বিল উপস্থাপন করেছেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি করে থাকেন, আপনি বিলের টাইটেলটি উল্লেখ করুন।

১৪. আপনার বিলের বর্তমান অবস্থা কি ?

ক. বিলটি আইনে পরিণত হয়েছিল ☐

খ. বিশেষ কমিটির বিবেচনায় আছে ☐

গ. গৃহীত হয়নি ☐

ঘ.অন্যান্য ☐

Dhaka University Institutional Repository

১৫. কমিটি মেম্বার হিসেবে আপনি কি কোন বিলে কাজ করেছেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, যদি হ্যা হয়, তা উল্লেখ করুন

১৬. আপনি কি.কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ?

১৭. আপনি কি কখনো আইন তৈরি প্রক্রিয়ায় নারী সদস্য হিসেবে আপনার ভূমিকা পালনে বিশেষ কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, তবে কি ধরণের বাঁধা।

ক. .....

খ. .....

গ. .....

১৮. সংসদীয় কমিটির আলোচনায় অংশগ্রহণকালে আপনার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয় কি না?

১৯. কোন সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে?

হ্যা ☐ না ☐

যদি হ্যা হয়, কমিটির নামটি বলুন।

৮. আপনি কি কখনো কোন কমিটির চেয়ার পারসন হয়েছেন?

হ্যা ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

যদি হ্যা হয়, আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

যদি না হয়,তার কারণ উল্লেখ করূন

২১. সংসদীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালনে পুরুষ সহকর্মীর নিকট থেকে আপনি কতটা সহযোগিতা পান ?

খুব ভাল ☐ মোটামুটি ☐ সন্তোষজনক নয় ☐

২২. নারী সাংসদ সদস্য হিসাবে পুরুষ সাংসদদেও নিকট থেকে কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কি?

আপনার উত্তর যদি হ্যা হয়, তবে তা উল্লেখ করূন

Dhaka University Institutional Repository

সেট-সুরমা

(নারী নেত্রীদের জন্য প্রণীত)

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন; বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ক পর্যালোচনা"বিষয়ক গবেষনা কর্মের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা

ক. উত্তরদাতার নাম:

খ. বর্তমান ঠিকানা:

বয়স: শিক্ষা: পেশা/পদবী:

১.আপনার বর্তমান সামাজিক অবস্থানে আপনার পরিবারের সদস্যদের মনোভাব কিরুপ?

২.পরিবার থেকে আপনি কি ধরনের উৎসাহ পেয়েছেন ? বিশেষ কারো অবদান থাকলে উল্লেখ করুন

৩. আপনার সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকার কারণ কি?

৪.নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনার সংগঠনের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করুন

৫.নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনটি অধিক কার্যকর

ক.সরকারের ভূমিকা

খ.বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

গ.সুশীল সমাজের ভূমিকা

ঘ.দাতাগোষ্ঠীর ভূমিকা

৫. নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়সমূহ কি কি বলে আপনি মনে করেন?

৬. সম্প্রতি প্রনয়নকৃত নারী উন্নয়ন নীতির খসড়াতে আপনার কোন মতামত /দ্বিমত আছে কি -উল্লেখ করুন ?

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে নারীদের প্রতিযোগিতা করার জন্য কি কি বিশেষ যোগ্যতা থাকা উচিত?

৮. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের নারীদের বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়নকল্পে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

৯. সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে নারী আসন সংরক্ষনের বিধান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

১০. জাতীয় সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

হ্যা ☐ না ☐

আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

১১. জাতীয় সংসদে নারী সাংসদের আসন বিন্যাস কিরুপ হওযা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ক. প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের দলীয়ভাবে ১/৩ নারী মনোনয়ন দান

খ. প্রতি জেলায় ১টি করে নারী আসন সংরক্ষণ

গ. বর্তমান সংশোধিত প্রস্তাবিত আসনই ঠিক আছে।

ঘ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১২. আপনার মতে বর্তমান সরকার কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ কিভাবে আরোও কার্যকরী করা যায়?

১৩.বর্তমান সংসদে সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ?

১৪. নারীস্বার্থসংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নে সংসদে অবস্থানরত মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের প্রভাব কতটুকু? উল্লেখ করুন।